শ্রীধীরেন বল

॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ॥ কলিকাতা—১২ ॥

প্রকাশক
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম মুদ্রণ
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৩৬৩

ছেপেছেন—
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা—

দাম : পাঁচ সিকা

উৎসর্গ

নীপার ছোট্ট হাতে সস্নেহে তুলে দিলাম
তার পরম আদরের প্রথম বই।

বাপি

এই লেখকের লেখা
ছোটদের কয়েকখানি
মনমাতানো বই……

আটখানা
তোলপাড়
কাড়াকাড়ি
ঠেকে হাবুল শেখে

—দু'টি কথা—

ছবি দিয়ে এই গল্পগুলি কিছুদিন আগে আনন্দবাজারে ধারাবাহিক ভাবে বের হতো। ছবিগুলির জন্যে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। এই ধরনের ছবি দিয়ে গল্পের বই এর আগে আমার আরো দু'খানি বেরিয়ে গেছে। সে দু'খানি ছোটদের কাছে সমাদরও পেয়েছে যথেষ্ট। রঙিন কালিতে ছেপে নতুন ধরণের অঙ্গসজ্জায় সাজিয়ে বইখানিকে লোভনীয় করে বের করবার জন্যে বন্ধুবর শ্রীপ্রহ্লাদ প্রামাণিককে কৃতজ্ঞতা জানান আমার কর্তব্য মনে করি। আমার ছোট্ট বন্ধুরা বইখানিকে কি ভাবে গ্রহণ করে, সেইটাই এবার আমার লক্ষ্য।

ইতি—

কলিকাতা
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৩৬৩

শ্রীধীরেন বল

—এতে আছে—

পিন্টুর চিড়িয়াখানা

ছোট—তবু প্রাণী তারা
জেনো এই বেলা,
তাদের জীবন নিয়ে
করো নাকো খেলা।
তোমার আঘাতে হায়,
তাহারাও ব্যথা পায়,
অসহায় বলে কভু
করো নাকো হেলা,
ভেবো নাকো ছোট প্রাণী
প্রাণহীন ঢেলা॥

বাবা বলেন ঃ পিণ্টু তুমি বাড়িতেই থাকো। তোমার জন্যে নিশ্চয় একটা ঘোড়া আনবো কিনে।

বাবা সত্যি কথাই বলেন—জানে পিণ্টু। কিন্তু বাবা হয়তো আনবেন একটা বড়ো ঘোড়া। বড়ো ঘোড়া চায় না পিণ্টু।

মা আশ্বাস দেন, বলেন ঃ না-না! একটা ছোট ঘোড়াই আনবো তোমার জন্যে। লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বিশুর সঙ্গে তুমি বাড়িতেই থাকো। সন্ধ্যে বেলায় দেখো কেমন সুন্দর একটা বাচ্চা ঘোড়া আনি তোমার জন্যে!

বাবা-মার কথা শুনে হয়তো বুঝ মানতো পিণ্টু, কিন্তু ছোড়দিটা! ও কেমন পিট্‌পিট্ করে হেসে পালিয়ে যায় আড়াল থেকে। যেতে যেতে বলে ঃ পিণ্টুর জন্যে আনবো একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া। প্রকাণ্ড দুটো ডানা। পিণ্টুকে নিয়ে উড়ে চলবে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে।

তাইতেই তো সব অবিশ্বাস করে বসে পিণ্টু। এসব ঠাট্টার মানে কি?
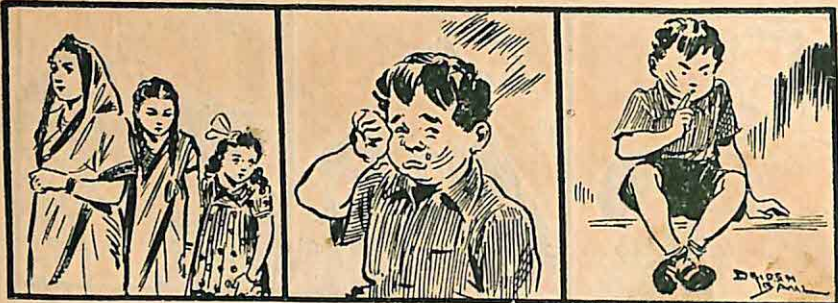
মা, মেজ পিসী, ছোড়দি সবাই আজ বাবার সঙ্গে যাচ্ছে ঝুলনের মেলায়।

পিণ্টুও ধরেছে বায়না। ঝুলনের মেলা কোনদিন তো দেখেনি পিণ্টু।

কিন্তু পিণ্টুকে কিছুতেই নিয়ে যাবে না ওরা সঙ্গে। বলেঃ অনেক ভিড় হবে সেই মেলায়। তা'ছাড়া অতো রাস্তা হাঁটতেও তো পারবে না পিণ্টু! নেহাৎ ছেলে মানুষ কিনা ও।

সেকথা শুনে সেই সকাল থেকেই কান্না জুড়ে দিয়েছে পিণ্টু। হ্যাঃ ছেলেমানুষ না ছাই! সব বাজে কথা!

বেশ হাঁটতে পারবে সে। ছ' বছর বয়স হলো তো তার। ছোড়দির সঙ্গে ছ'দিন পিণ্টু গিয়েছিল ওদের ইস্কুলে! একটুও পা ব্যথা করেনি। তবে আর ও-কথা কেন?

মেলায় সে কি আর অমনি অমনিই যেতে চায়? ক'দিন ধরে যে একটা মতলব এঁটে রেখেছে পিণ্টু। একটা ছোট্ট ঘোড়ার বাচ্চা কিনবে সে মেলায়। খেলনা নয়, একেবারে সত্যিকারের ঘোড়ার জ্যান্ত বাচ্চা!

ছোড়দিটাই শেষ পর্যন্ত বাদ সাধবে পিন্টু ঠিক জানে। বাবা-মাকে ব'লে ও-ই হয়তো দেবে না ঘোড়ার বাচ্চা কিনতে।

পিন্টু চিড়িয়াখানা করে এ-যে চায় না ছোড়দি। অনেকবারই তো ছোড়দি এ নিয়ে করেছে পিন্টুর সঙ্গে ঝগড়া।

ছোড়দি বলে ঃ পিন্টু তুই যাদুঘর তৈরি কর। চিড়িয়াখানাতে দরকার হয় জ্যান্ত জীবজন্তু। তাদের রোজ খেতে দিতে হয়। তা না হলে না খেতে পেয়ে ওরা মরে যাবে, আর ভয়ানক পাপ হবে তোর। জানিস তো পাপের শাস্তি কি ?

যমপুরীর ছবি দেখেছে পিন্টু। পাপের শাস্তি সে জানে।

মহা ভাবনায় পড়ে পিন্টু।

নাঃ, যাদুঘর পিন্টু মোটেই পছন্দ করে না! কী সব ইট-পাটকেল, পাথর আর জন্তু জানোয়ারের হাড়গোড়ে ভরতি। পিন্টু চায় না যাদুঘর!

চিড়িয়াখানা ঢের ভালো যাদুঘরের চাইতে।
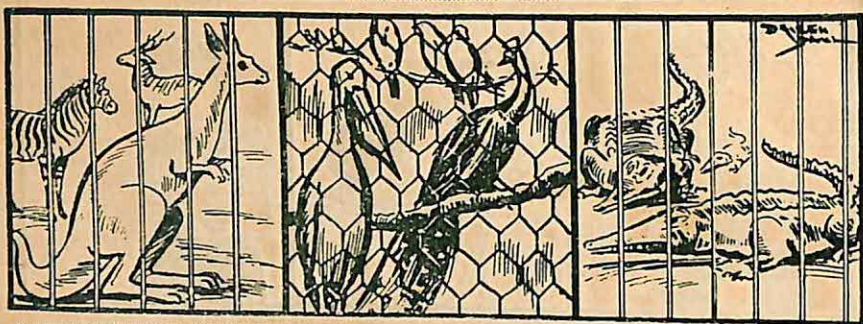
বাবা-মার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে পিন্টু চিড়িয়াখানা দেখে এসেছে। ওঃ, কতো সব মজার মজার জন্তু-জানোয়ার!

বাঘ-সিংহ হাতি-গণ্ডার তো আছেই, তা'ছাড়া হরিণ, জেব্রা, ক্যাঙারু—কতো কি!—অতো সব নামই জানে না পিন্টু।

ছোড়দির একটা ছবির বইয়ে অনেক জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখেছে পিন্টু। চিড়িয়াখানায় আছে তার চাইতেও ঢের বেশি জীবজন্তু।

চিড়িয়াখানার পাখিগুলো দেখেও আনন্দ পেয়েছে পিন্টু। কতো যে রং-বেরংয়ের পাখি।

ইয়া বড়ো বড়ো ময়ূর। পেখমের পালকে তাদের কতো যে রংয়ের বাহার!

পিন্টুর সবচাইতে ভালো লেগেছিল কুমিরগুলো দেখতে।

কেমন জলের ধারে মড়ার মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকে কুমিরগুলো,—ধাড়ি কুমির, বাচ্চা কুমির! এই বড়ো হাঁ, আর গায়ে চাকা চাকা কাঁটা। বড়ো বড়ো শাদা দাঁতে মুখ ভরতি।

সেই থেকেই পিণ্টুর সাধ—সে-ও অমনি একটা চিড়িয়াখানা তৈরি করে।

ছোড়দি শুনে হেসে বলে ঃ অতোসব জন্তু-জানোয়ার তুই পাবি কোথায় ? ও সব কিনতে দামও তো লাগে ঢের! কে তোকে দেবে সে টাকা ? টাকা কি গাছের ফল ?

ছোড়দিটা এক্কেবারে বোকা!

চিড়িয়াখানা করতে গেলে মাথায় বুদ্ধি থাকা চাই। ছোড়দির মাথায় বুদ্ধি কোথায় ? খালি আছে মাথা ভরতি এক-মাথা কোঁকড়ানো চুল। তার ফিতেরই বা কি বাহার! একটুও পছন্দ করে না পিণ্টু এই সব স্টাইল!

ওর চেয়ে তিন বছরের বড়ো হ'লে কি হয়, আসলে ওর মগজে নেই একটুও বুদ্ধি! না কিনলে বুঝি আর চিড়িয়াখানা হয় না ?

পিণ্টু বাজে কথা বলে না। এইতো, এই ক'দিনেই সে প্রায় সাত আট রকমের জীবজন্তু জোগাড় ক'রে ফেলেছে। আর ক'দিনেই আরো অনেক বাড়িয়ে ফেল্‌বে সে। কিন্তু ঘোড়ার বাচ্চা—
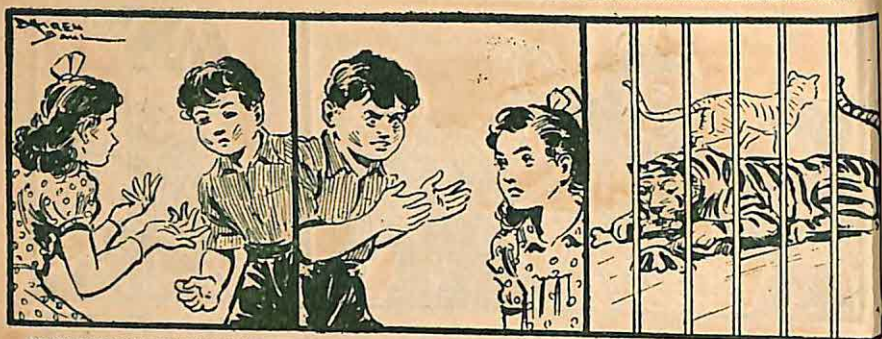
ওর চিড়িয়াখানার জন্যেই তো পিণ্টু চেয়েছিল একটা ঘোড়ার বাচ্চা।

ছোড়দি শুনে টিট্‌কিরি দেয়।

বলেঃ ঘোড়ার বাচ্চাকে খেতে দিবি কি? না খেতে পেয়ে যে ও মরে যাবে দু'দিনেই!

কী বোকা মেয়ে ছোড়দিটা!

কেন? ঘোড়ার বাচ্চাকে সে কচি কচি ঘাস খেতে দেবে। তাদের বাগানের ধারেই তো কেমন সুন্দর তাজা আর কচি কচি দুব্বো ঘাস প্রচুর রয়েছে! কেটে এনে তাকে খাওয়াবে পিণ্টু পেট পূরে।

চিড়িয়াখানায় যে জ্যান্ত জীবজন্তু থাকে, আর তাদের যে খেতে দিতে হয় তা কি পিণ্টু জানে না?

পিণ্টুকে ওরা ভাবে কি বল তো?

বাঘের খাঁচায় ডেলা ডেলা মাংস আর হাড় দিতে দেখেছে পিণ্টু কলকাতায়।

তাইতো পিণ্টুও দেয় তার চিড়িয়াখানার জীবজন্তুদের রকমারি খাবার।
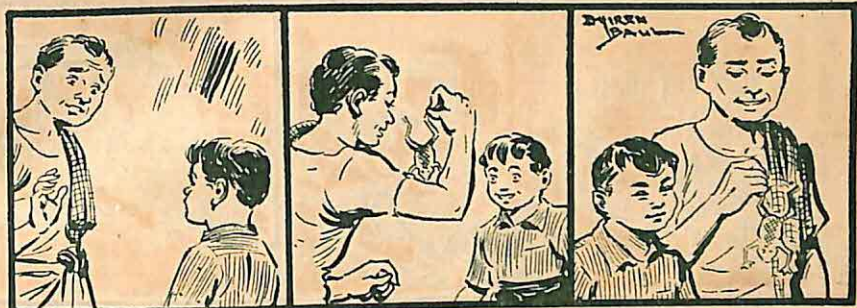
বিশু বলে ঃ পিণ্টুবাবু, বিকেল হলো। চলো, রাস্তার ধার থেকে আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

ছাই বেড়ানো! সবাই গেলো মেলায়, ফেলে গেল পিণ্টুকে একা বাড়িতে।

বিশু বলে ঃ আজ তোমার চিড়িয়াখানার জন্যে ভারী মজার কিছু একটা ধরে এনে দেবো!—চলো!

বেড়াতে গিয়ে বিশু মাঠের ওধার থেকে কি একটা ধরে আনে। পিণ্টু দেখে—ওমা! কি বিচ্ছিরি একটা ব্যাঙ!

বিশু বলে ঃ পিণ্টুবাবু, তোমার চিড়িয়াখানায় তো আর ব্যাঙ নেই, এই ব্যাঙটা থাক্‌বে তোমার চিড়িয়াখানায়।

ব্যাঙকে ভয় করে না পিণ্টু। কিন্তু কি বিচ্ছিরি আর নোংরা ওই ব্যাঙ! দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। ছোড়দি হয়তো হাসবে। হাস্থক! চিড়িয়াখানা যখন, তখন ব্যাঙও তো থাকতে পারে সেখানে!

সন্ধ্যে হলো। বেড়ানো শেষ ক'রে বিশুর সঙ্গে পিণ্টু ব্যাঙটা নিয়ে ফিরে আসে বাড়ি।

বাবা-মা-মেজ পিসী-ছোড়দি কেউ তখনো ফেরেনি মেলা থেকে। একা একা একটুও ভালো লাগে না পিণ্টুর। অভিমানে বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে।

সিধে তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে পিণ্টু।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে কখন! এখনো ফিরলো না ওরা সব। কতো বেড়াচ্ছে, কতো কি মজার মজার জিনিস দেখছে, আর কতো কি যে কিনছে তার ঠিক নেই!

আর পিণ্টু? তাকে রেখে গেছে বিশুর কাছে বাড়িতে একলা ফেলে!

তবু বিশু ভালো! তার চিড়িয়াখানার জন্যে অন্ততঃ একটা ব্যাঙ জোগাড় ক'রে দিয়েছে সে! আর একটা জীবও তো বাড়লো তার চিড়িয়াখানায়! বাবা-মা যদি আজ তার জন্যে ঘোড়ার বাচ্চা না কিনে আনেন, তাহ'লে কথাই কইবে না পিণ্টু কারো সঙ্গে আর। একেবারে ক'রে দেবে আড়ি!

ঘোড়ার বাচ্চা একটা চাই-ই পিণ্টুর,—জ্যান্ত ঘোড়া!
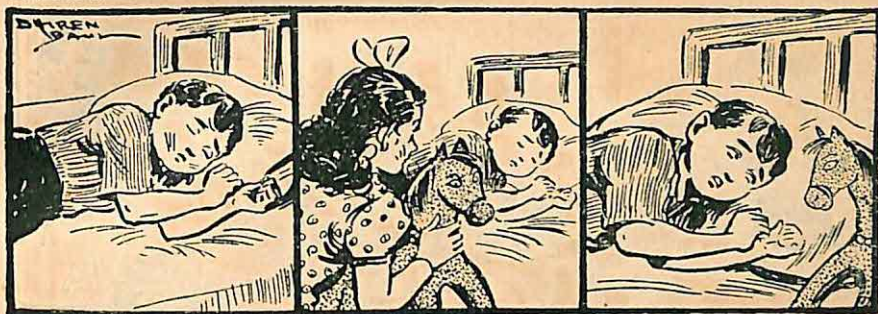
খট্-খট্! ঠুং-ঠাং! ঝুন্-ঝুন্!

ওই বুঝি মেলা থেকে ফিরে এলো ওরা সব! হ্যাঁ, ওরাই তো!

দেয়ালের দিকে মুখ করে' তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শোয় পিন্টু।

কথা কইবে না কারো সাথে। পিট্ পিট্ করে' চোখ বুজে মট্‌কা মেরে পড়ে' থাকে পিন্টু বিছানায়! ঠিক যেন ঘুমিয়ে আছে পিন্টু!

দরজা ঠেলে ছুটে ঘরে ঢুকলো এসে ছোড়দি!

ঃ পিন্টু, ও পিন্টু! এই দেখ্—কী সুন্দর একটা ঘোড়া কিনে এনেছি আমরা তোর জন্যে!

নাঃ, চোখ চাইবে না পিন্টু। কিছুতেই না! ঘোড়া না হাতি! ঘোড়া হলে তার পায়ের আওয়াজই তো শুন্‌তে পেত পিন্টু।

চোখের ফাঁক দিয়ে একটু আড়চোখে চেয়ে নেয় পিন্টু।

ওমা! ও কি? ও যে একটা পুতুল! ও ঘোড়া কি আর দৌড়তে পার্‌বে? জ্যান্ত ঘোড়া তো নয় ওটা!

এইবার সত্যিই কেঁদে ফেলে পিন্টু! সবাই মিলে খুব ফাঁকি দিয়েছে পিন্টুকে, সাংঘাতিক রকমের ফাঁকি!

এই বুঝি তার জন্যে জ্যান্ত ঘোড়ার বাচ্চা আনা? এ যে একটা লোমওয়ালা কাঠের ঘোড়া।

হায়রে! মাঝখান থেকে তার মেলায় যাওয়াটা ঘট্‌লো না। গেলে কখনো এমন ঘোড়া কিনত না সে।

ফাঁকি, স্রেফ্ ফাঁকি।

পিন্টু কাঁদে, পা ছড়িয়ে কাঁদে। চোখের জলে তার বালিশ ভিজে যায়।

কেন তাকে এমনভাবে ফাঁকি দেওয়া হলো? ও-ই বুঝি জ্যান্ত ঘোড়ার বাচ্চা?

বাবা বলেন: তোমার জন্যে জ্যান্ত ঘোড়ার বাচ্চা অনেক খুঁজেছি পিন্টু! কিন্তু ও-মেলায় তো জ্যান্ত ঘোড়া বিক্রী হয় না, তাই ওই কাঠের ঘোড়া আনা হয়েছে। খুব ভালো আর দামী ওটা।

হোক দামী! কাঠের পুতুল তো! না পারবে ছুটতে, না পারবে চলতে ফিরতে! ওটাকে কি আর তার চিড়িয়াখানায় রাখা যায়?

সব জ্যান্ত জীবজন্তুর পাশে একটা কাঠের ঘোড়া! কী বলবে লোকে? ছিঃ!

এই নিয়ে শেষে ওই ছোড়দিটাই দেবে তাকে কতো টিট্‌কিরি! অসহ্য ওই ছোড়দির টিট্‌কিরি!

মা এসে খেতে ডাকেন পিণ্টুকে।

না, পিণ্টু খাবে না কিচ্ছু! মা-ই তো চালাকি করে পিণ্টুকে একা বাড়িতে ফেলে গেছেন। নইলে, বাবা তো বলেছিলেন : যাক না ও সঙ্গে!

পিণ্টু চোখ বুজে বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকে বিছানায়।

পিণ্টুর বুঝি রাগ নেই? খাবে না সে আজ রাতে! সবাই মিলে পণ্ড করবার মতলবে আছে তার চিড়িয়াখানাটা!

অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদে পিণ্টু।

অনেকক্ষণ কাঠের ঘোড়াটা পড়ে রয়েছে পিণ্টুর শিয়রের কাছে। রাগে আর অভিমানে হাতে তুলেও নেয় নি পিণ্টু ঘোড়াটাকে। ও দিয়ে কি কর্‌বে পিণ্টু? কোন্ কাজে লাগবে তার? শেষকালে, ছিঃ ছিঃ! তার চিড়িয়াখানায় কিনা একটা কাঠের ঘোড়া!

কিন্তু অবাক কাণ্ড! কাঠের ঘোড়াটা দেখি আবার উঠে দাঁড়ায়। আবার ওই যে এক পা দু' পা করে' ধীরে ধীরে পিণ্টুর কানের কাছে এগিয়ে আসে!

তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলে: দুঃখু করো না পিণ্টু। আমি তো এখন তোমারই। তোমায় ওরা ঠকিয়েছে বটে, কিন্তু আমি ঠকাব না! জানো—কাঠের তৈরি হলেও, ঠিক জ্যান্ত ঘোড়ার মতোই আমি চলতে ফিরতে দৌড়তে পারি। এমন কি, দেখছো তো কথাও বলতে পারি—যা অন্য ঘোড়া পারে না।

পিণ্টু অবাক হয়!

ঘোড়াটা বলে: বিশ্বেস না হয়, তুমি আমার পিঠে উঠে একবার বসো। দেখো, আমি তোমায় কোথা থেকে বেড়িয়ে আনি।
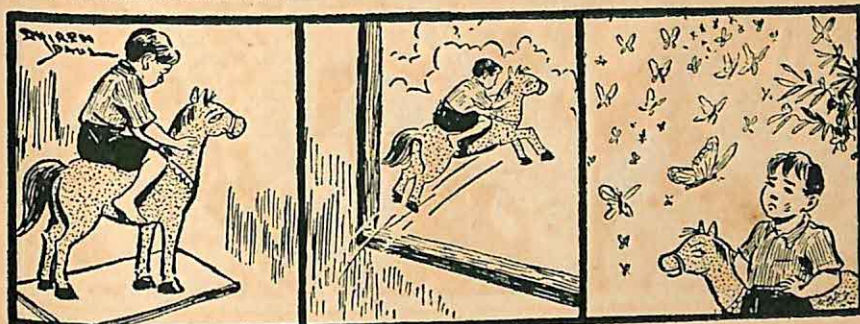
পিন্টুর বিশ্বাস হয় না এসব কথা। ভাবে, এ কখনো সম্ভব? হয়তো সে ভুল শুনছে।

পরীক্ষা করতে চট্‌পট্ উঠে চেপে বসে পিন্টু সেই কাঠের ঘোড়াটার পিঠে!

খট্-খট্-খট্—পোঁ।

ঘোড়াটা দেখি পিন্টুকে পিঠে করে জান্‌লা গলে উধাও।

এ আবার কি! এ যে একেবারে পক্ষীরাজের মতো আকাশপথে উড়ে চলেছে পিন্টুকে পিঠে করে! ভয়ে চোখ বুজে পিন্টু জাপ্‌টে ধরে থাকে ঘোড়ার গলাটা।

বাঃ রে!

চোখ মেলে দেখে পিন্টু এ কোথায় এসেছে সে! এ যে দেখি প্রজাপতির দেশ! চারদিকে রং বেরংএর কতো সব প্রজাপতি! ছোট-বড় লাল-নীল!

ভারি অবাক হয়ে যায় পিন্টু!

পিণ্টুকে দেখে একটা বড় প্রজাপতি এগিয়ে আসে কাছে।

বলে : তোমারি নাম পিণ্টু ?

পিণ্টু বলে : হ্যাঁ !

প্রজাপতি বলে : তুমি ভারি খারাপ ছেলে! তুমি তোমার চিড়িয়াখানায় আটকে রেখেছো আমার দুটি ছেলেকে ?

পিণ্টু কী জবাব দেবে ভাবছে।

প্রজাপতি বলে : জানো, আমাদের ছেড়ে থাকতে ছেলে দুটোর কী কষ্ট হচ্ছে! মা তোমায় ফেলে ঝুলনের মেলায় গেছল বলে অভিমানে কেঁদেকেটে তুমি অস্থির! তেমনি, বাপ-মা ছেড়ে থাকতে আমাদের ছেলে দুটোর কী কষ্ট হচ্ছে—ভাবো কি তা ?

তাই তো! ভারী লজ্জা পায় পিণ্টু। মাথা গুঁজে বসে থাকে সে। প্রজাপতিটা এবার বলে : ফিরে গিয়ে ওদের ছেড়ে দেবে তো ?

পিণ্টু বলে : হ্যাঁ দেবো।

ঘোড়াটা পিন্টুকে পিঠে করে আবার উড়ে চলে।

এবার এসে তারা হাজির হয় ফড়িংএর দেশে।

ফড়িংএর দেশে আকাশ ছেয়ে শুধু ফড়িং আর ফড়িং! কতো রকমের, কতো রং-বেরংয়ের যে ফড়িং তার আর লেখা-জোখা নেই!

পিন্টুকে দেখে একটা ফড়িং এগিয়ে এসে বলে: পিন্টু তুমি ভারি অন্যায় করেছ!

মাথা নেড়ে পিন্টু বলে: হ্যাঁ, বুঝেছি যে আমি অন্যায় করেছি!

ফড়িং বলে: শুধু তাই নয়, তুমি আমার ভাইটির ন্যাজে কষে সূতো বেঁধে তোমার চিড়িয়াখানায় আটকে রেখেছ। ন্যাজটা ওর প্রায় কেটে যাবার জোগাড়। ওর ব্যথাটা অনুমান করতে পারো তুমি?

পিন্টু বলে: ফিরে গিয়ে খুলে দেবো!

ফড়িং বলে: হ্যাঁ, তাতো দেবেই। ভেবে দেখো তোমার হাতখানা কষে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে তোমার যেমন ব্যথা লাগে, তেমনি তো আমাদেরও লাগে! ছোট হলেও আমরা তো প্রাণী বটে।

পিন্টু বলে: ঠিক কথা।

পিণ্টুকে পিঠে করে ঘোড়াটা এলো কাঠবেড়ালীদের দেশে।

গাছে গাছে আশেপাশে কতো সব কাঠবেড়ালী! একটা ধাড়ি গোছের কাঠবেড়ালী এগিয়ে আসে পিণ্টুর কাছে।

পিণ্টু ভয়ে ভয়ে আগেই বলে ফেলে: ঘরে ফিরেই চিড়িয়াখানা থেকে কাঠবেড়ালীটাকে ছেড়ে দেবো—কথা দিচ্ছি!

কাঠবেড়ালী বলে: নিশ্চয়ই দেবে! সত্যি, তুমি কি পাষণ্ড বলতো! তিনদিন ধরে' আটকে রেখেছে আমার বাছাকে তোমার ওই জঘন্য চিড়িয়াখানায়, অথচ কিছু খেতে দাওনি তাকে। রাগ করে মাত্র আজ রাত্রিটায় কিছু খাওনি তুমি, তাতেই বুঝছো তো কী কষ্টটা হচ্ছে তোমার।

পিণ্টু বলে: খেতে তো দিইছি তাকে,—পোকা-মাকড় জল—

মুখ ভেংচে কাঠবিড়ালী বলে: তোমার মাথা আর মুণ্ডু! আমরা কী কখনো তোমার ওই পোকা-মাকড় খাই? কিচ্ছু জানো না, আর করেছো চিড়িয়াখানা! একটা আস্ত বোকা ছেলে!

ভারী লজ্জা পায় পিণ্টু!

পিণ্টু ভারি বিব্রত হয়ে পড়ে এ-সবে। বলে ঃ ঘোড়াভাই! ঢের হয়েছে, এবার তুমি আমায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। ঘোড়া বলে ঃ কেন, টুনটুনি পাখিদের ওখানে যাবে না একবার? পিণ্টু বলে ঃ হ্যাঁ, যাই আর সবাই মিলে দিক আমায় আরো কতকগুলো কথা শুনিয়ে! তার চেয়ে তুমি ফিরে চলো।

পিণ্টুকে নিয়ে ঘোড়াটা ফিরতে যাবে, এমন সময় এক ঝাঁক টুনটুনি এসে ঘিরে ধরে পিণ্টুকে। একটা টুনটুনি বলে ঃ আমাদের সাথীকে তুমি জেলখানা থেকে ছেড়ে দেবে কিনা বলো। পিণ্টু বলে ঃ জেলখানা তো নয়, খুব ভালো খাঁচাতে করে রেখে দিয়েছি।

ঠোঁট খিঁচিয়ে টুনটুনি বলে ঃ মানুষ যাকে খাঁচা বলে, তা যে আমাদের কাছে জেলখানা, এটুকুও জানোনা তুমি? কী বোকা ছেলে গা!

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি শুধ্‌রে নেয় পিণ্টু ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। সত্যি বলছি এবার ঘরে ফিরেই তাকে মুক্তি দেবো।

কাঠের ঘোড়াটা কী দুষ্টু গো! বাড়ি ফের্‌বার পথে খালি এখানে ওখানে দেরি করে, আর পিণ্টুকে হতে হয় নাজেহাল! তার চিড়িয়াখানার জীবজন্তুদের আত্মীয়স্বজনেরা যাচ্ছেতাই শুনিয়ে যায় তাকে।

পিণ্টু বলে : আর নয় ঘোড়াভাই! এবার সিধে বাড়ি।

ঘোড়া বলে : কেন, তোমার চিড়িয়াখানার সব জীবজন্তুদের দেশই তো এটা। ওই দেখো, জোনাকি, মৌমাছি, ব্যাঙ, টিক্‌টিকি—যাদের তুমি আট্‌কে রেখেছ তোমার চিড়িয়াখানায়—তাদের বাড়ি থেকে সবাই তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে এই দিকেই।

পিণ্টু বলে : দোহাই ঘোড়াভাই, বাড়ি ফিরেই আমার চিড়িয়াখানা একেবারে খালি ক'রে দেবো। তুমি ফিরে চলো। চাও তো তোমাকেও দিয়ে দেবো ছুটি। কিন্তু আর এখানে নয়!

কাঠের ঘোড়া একটু মুচ্‌কি হেসে পিণ্টুকে পিঠে করে ফিরে চলে ঘর পানে। নামিয়ে দেয় পিণ্টুকে তার সেই বিছানায়—সেই ছোট্ট খাট আর সেই ছোট্ট বালিশ। বড় পরিশ্রান্ত সে, অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়ে সে বড় আরামে।

ঃ পিণ্টু, ও পিণ্টু,—ওমা! কতো বেলা অবধি পড়ে' পড়ে' ঘুমোয় ছেলেটা!—ছোড়দি এসে জাগিয়ে দেয় পিণ্টুকে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পিণ্টু। বলে ঃ কাঠের ঘোড়াটা কি চলে গেছে ছোড়দি?

ছোড়দি বলে ঃ যাবে কোথায়? এইতো পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিস, পড়ে রয়েছে খাটের তলায়! ওকি আর জ্যান্ত ঘোড়া, যে, কোথাও চলে যাবে?

ছোড়দি জানে না ওই কাঠের ঘোড়াটা জ্যান্ত কিনা! কাল রাতের ঘটনাগুলো মনে জাগতেই পিণ্টু গম্ভীর হয়।

ধীরে ধীরে বলে ঃ ওই কাঠের ঘোড়াই আমার ভালো ছোড়দি, চাইনে আমি জ্যান্ত ঘোড়ার বাচ্চা! প্রজাপতি, ফড়িং আরশোলা সব ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা মাকড়ের রাগই সামলানো দায়, সত্যিকারের ঘোড়া ওটা হলে, ঠিক আমায় কামড়ে দিত! ছোড়দি, আমি চিড়িয়াখানা তুলে দিলাম আজ থেকে একেবারে।

অবাক হয় ছোড়দি। বলে: সে কিরে পিণ্টু! এরি মধ্যে চিড়িয়াখানা তুলে দিবি কেন? তুই না তোর চিড়িয়াখানায় আরো কতো পোকামাকড় জীবজন্তু রাখবি বলেছিলি? কি হলো তোর?

পিণ্টু বলে: না ছোড়দি, ওদের চিড়িয়াখানায় ধরে' রেখে সত্যিই আমি বড়ো কষ্ট দিই। ওরা মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারে না বটে, কিন্তু ওদের দেশে গেলে, ওদের আপনার লোকজন কেমন তেড়েমেড়ে আসে জানো?

: সে কিরে পিণ্টু! কাল রাতে বুঝি তুই স্বপ্ন দেখেছিস্? ছোড়দি হাসে।

পিণ্টু বলে: হাস্‌ছো? হাসো। কিন্তু স্বপ্ন হ'লে কি হয়? পড়্‌তে যদি ওদের পাল্লায়, তো চিড়িয়াখানার সাধ তোমার ঘুচে যেতো একদম! সত্যি ছোড়দি, জ্যান্ত জীবজন্তুদের দিয়ে চিড়িয়াখানা তৈরী করা অন্যায় আমাদের।

ছোড়দি হেসে বলে: পিণ্টুর আমাদের সত্যিই এবার জ্ঞান হয়েছে। ছোট ছোট প্রাণীদের কথা দরদ দিয়ে ভাবতে শিখেছে পিণ্টু।

ঃ সাবধানে ছোড়দি! সাবধানে! দেখো, সূতোর বাঁধন খুল্‌তে গিয়ে যেন ফড়িংএর ন্যাজ কেটে না যায়! আমি এদিকে এই প্রজাপতির বাঁধন খুলে দিচ্ছি।

বাঁধন খুল্‌তেই ছাড়া পেয়ে চলে যায় প্রজাপতি আর ফড়িংরা।

ঃ ছোড়দি! টুন্‌টুনির খাঁচার মুখটা খুলে দিই আমি, তুমি ছেড়ে দাও ওই কাঠবেড়ালীটাকে! তারপর বিশুদাকে ডেকে এনে খুলে দাও ওই ব্যাঙের ঠ্যাংএর বাঁধন।

ছাড়া পেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে খালি হ'য়ে যায় পিণ্টুর গোটা চিড়িয়াখানা। ছাড়া পায়—জোনাকি, মৌমাছি, টিকটিকি সবাই!

এইবার নিশ্চিন্ত হলো পিণ্টু। দুশ্চিন্তার বোঝা তার আজ থেকে কমে গেলো একেবারে। সারাদিন চিড়িয়াখানা নিয়ে অতো যে খাট্‌তো পিণ্টু, তাতে ওদের কষ্টই বাড়্‌তো শুধু! ছেলেখেলা করতে গিয়ে জ্যান্ত জীবজন্তুদের কষ্ট দিত সে খামোকা। আমাদের মতোই ওদেরও তো বোধশক্তি আছে!

তাছাড়া কথাটা লুকিয়ে রেখেই বা লাভ কি?—দুটো কাঠপিঁপড়ে, একটা উচ্চিংড়ে আর একটা গঙ্গাফড়িংতো মরেই গেল সেদিন!
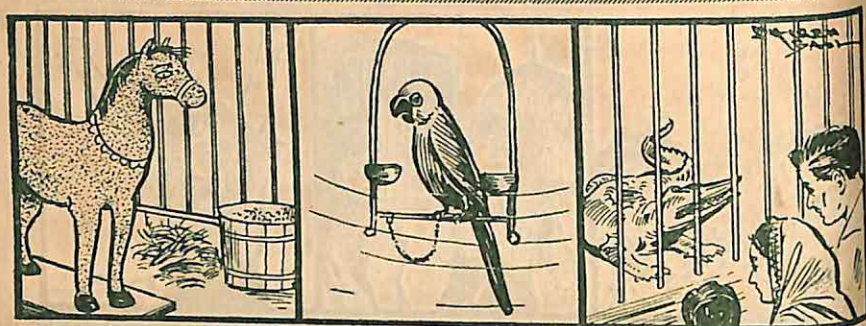
নতুন করে' একটা চিড়িয়াখানা করেছে এবার পিণ্টু। প্রথমেই একটা রেলিং-ঘেরা ঘরে রয়েছে সেই কাঠের ঘোড়া। সামনে তার ছোলার টব, আর একপাশে কচি কচি ঘাস। কাঠের ঘোড়া তো, কিছুই খায় না। তাই, পিণ্টুকেও এ নিয়ে রোজ রোজ হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না!

ওই দেখো—দাঁড়ে বসে' দোল খাচ্ছে চিড়িয়াখানায় টিয়ে। ছাতু আর কলা মেখে দিয়েছে পিণ্টু। কিন্তু ভয় নেই, ও ছাতু কখনো ফুরোবে না। কাঠের টিয়ে কিনা!

অবাক হয়ে গেলে তো? ভাবছো—চিড়িয়াখানায় পিণ্টু কুমিরও জোগাড় করেছে? হ্যাঁ, কুমিরই বটে, তবে কেষ্টনগরের মাটির পুতুল।

এ ছাড়া পিণ্টুর চিড়িয়াখানায় আছে—বাঘ-হাতি-গণ্ডার, নেকড়ে, ভালুক-ক্যাঙ্গারু, জলহস্তী, সিন্ধুঘোটক—কতো কি! সব প্ল্যাষ্টিকের। পিণ্টুর বাবা পিণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে একদিন দোকান থেকে কিনে দিয়েছেন।

পিণ্টুর পড়বার ঘরের বারান্দার একটা দিক জুড়ে পিণ্টুর এই চিড়িয়াখানা।

পিণ্টুর বাবা-মা বন্ধু-বান্ধব পিণ্টুর এই নতুন চিড়িয়াখানা দেখেই আনন্দ পান বেশি, এমন কি পিণ্টুর ছোড়দিও।

রামু

ভাল ছেলে হলে তার
থাকে নাকো দোষ,
না জেনে তাহার 'পরে
মিছে করো রোষ।
কাছে যারা থাকে তার
করে নেয় আপনার,
তুমি তারে না চিনিলে
করো আফ্‌শোষ॥
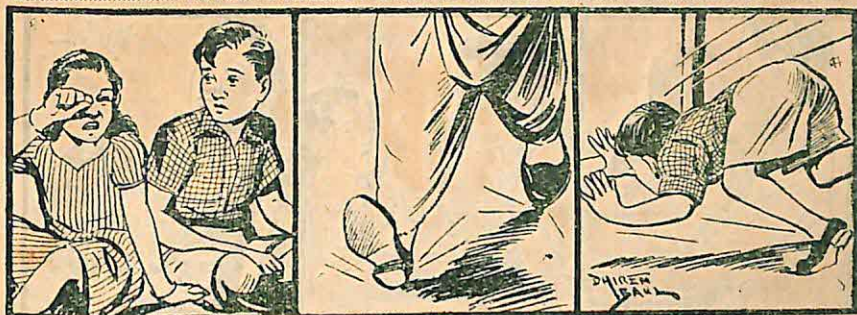
ঃ উ-হুঁ—উঁ-উঁ·· ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ !

চিৎকার করে কেঁদে ওঠে বিনু।

নিশ্চয় রামু মেরেছে ওকে।

ঃ দস্যি ছেলে ! দাঁড়া আজ দেখাচ্ছি তোকে মজাটা !—রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন মা। পড়্‌বার ঘর থেকেও ছুটে বেরোয় মেজদা।

মেজদা শহরে থাকে, সেখানকার কলেজে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছে বাড়ি। ছোট বোন বিনুকে মেজদা বড় ভালবাসে। নাঃ, রামুর আজ আর রক্ষে নেই! মেজদা বাড়িতে থাকতে বিনুকেই কিনা মারা !

খট্-মট্—খট্-মট্ !

ক্রমেই এগিয়ে আসে মেজদার জুতোর আওয়াজ।

কানে ধরে টেনে তোলে মেজদা রামুকে, তারপর দু'চারটে কীল্-চড় পিঠে বসিয়ে ধাক্কা দিয়ে টেনে ফেলে দেয় বাইরে বারান্দায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে' যায় রামু। নাকটা বুঝি ওর থেঁতলেই গেলো ! আশ্চর্য ! একটুও কিন্তু কান্নার আওয়াজ শোনা গেল না রামুর মুখ থেকে।

বিনুকে নিয়ে চলে' আসে মেজদা তার পড়বার ঘরে। ভারি লক্ষী মেয়ে বিনু। কাছে নিয়ে বিনুকে ইতিহাসের পড়া বলে দেয় মেজদা। বুদ্ধদেব কে ছিলেন, মানুষের তিনি কি উপকার করেছিলেন, কেন তিনি গৃহ-স্ত্রী-পুত্র সব ত্যাগ করে' সন্ন্যাসী হয়েছিলেন—এইসব।

খুব মন দিয়ে শোনে বিনু। হঠাৎ প্রশ্ন করে' বসে ঃ আচ্ছা মেজদা, রামুদাও কি তা হ'লে ওই বুদ্ধদেবের মতোই বাড়িঘর সব ত্যাগ করে' চলে যাবে ?

ঃ কেন ?—অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে মেজদা।

ঃ সন্ন্যাসী হবে বলে—বিনু জবাব দেয়।

ঃ দূর, তাও কি হয় ? বুদ্ধদেব মানুষের ঘরে জন্ম নিলেও আসলে তিনি ছিলেন ভগবান। তাঁর যে অনেক বেশি গুণ ছিল—মেজদা বলে।

ঃ কেন, ওরকম গুণ তো রামুদারও অনেক আছে। জানো মেজদা, রামুদা খুব ভাল ছেলে,—সবাই বলে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মেজদা বলে ঃ তা বই কি! না হ'লে যখন তখন তোকে ধরে' অমন মারে ?

ঃ কৈ সে তো আমায় মারেনি কখনো !—অবাক হয়ে বলে বিনু।

ঃ রামু যদি তোকে মারেই না কখনো, এই একটু আগেই তবে কাঁদছিলি কেন ? প্রশ্ন করে মেজদা।

ঃ সে-তো আমার ছবির বইটা ও নন্দকে দিয়ে দিয়েছে বলে’। রামুদা বলে, জানিস বিন্নু, নন্দরা ভারী গরিব। ছ’বেলা খেতে পায় না, তা ছবির বই কিন্‌বে কি করে ?—বই পড়তে ও খুব ভালবাসে কি না তাইতেই তো রামুদা আমার বইটা নন্দকে দিয়ে দিয়েছে। বইয়ের শোকে ফের্ বিন্নুর ছ’চোখ ছল্ ছল্ করে’ আসে।

পরীক্ষার ছলে মেজদা প্রশ্ন করেঃ তোকে বুঝি মোটেই ভালবাসে না রামু ? জলভরা চোখে বিন্নু বলেঃ হ্যাঁ, তাই বই কি ? রামুদা আমায় খুব ভালবাসে, খু-উ-ব ! ঃ তবে তুই-ই বুঝি রামুকে ভালবাসিস্ না ?—প্রশ্ন করে মেজদা।

চোখ বড় বড় করে ঘাড় বাঁকিয়ে বিন্নু বলেঃ আমিও খুব ভালবাসি। জানো মেজদা, ও বইটা তো রামুদাই আমাকে দিয়েছিল। আরো কতো জিনিস দিয়েছে আমায় রামুদা—বিস্কুট লজঞ্জুস, ফিতে, পেন্সিল, বই, পুতুল—কতো কি !

ছোট বাক্সটা খুলে’ দেখায় বিন্নু মেজদাকে সব।

ঃ হাঁরে বিনু, স্কুলে যেতে হবে না। নেয়ে খেয়ে তৈরী হয়ে নে। রামু কোথায়? রান্নাঘর থেকে ডেকে বলেন মা।

ঃ রামুদা তো মা, ওই বারান্দায় পড়েছিল, মেজদা যে মেরেছে ওকে। তবে বুঝি আমায় ফেলেই পুকুরে নাইতে গেছে।

মাথায় তেল দিয়ে গামছাটা নিয়ে বিনু পুকুরে ছোটে।

অনেক ছেলেমেয়ের ভিড় পুকুর ঘাটে। ছেলেরা সব রামুর দলের। এক বয়সী। বিনুকে দেখতে পেয়ে ছেলেরা ছুটে আসে।

জিগ্যেস করেঃ রামু কোথায় রে বিনু? কথা ছিল রামুকে হারিয়ে দিয়ে যে আজ সাঁতরে ওপারে গিয়ে ফের এপারে আগে ফিরে আসবে, রামু তাকে নিজের থেকে পুরস্কার দেবে। অবিশ্যি, ওকে হারিয়ে দেওয়া অত সহজ নয়। তা, ও এখনো এল না কেন রে?

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে বিনু।

ঃ রামুদাকে মেজদা মেরেছে যে, তাই কোথায় চলে গেছে! নাওয়া আর হলো না বিনুর। বাড়ি ফেরে সে।

মা জিগ্যেস করেন : না নেয়েই ফিরে এলি যে বড় ?

: না মা, রামুদা পুকুরেও যায় নি। মা, রামুদা নিশ্চয় বুদ্ধদেবের মতোই গৃহত্যাগ করে চলে গেছে। কাঁদতে থাকে বিনু।

মা-ও চিন্তিত হন খুব : তাইতো, গেল কোথায় ছেলেটা ? হাঁ রে মণি, রামুকে তুই অমন মার্‌তে গেলি কেন ? সে-তো মার খাবার ছেলে নয়।

মণি অর্থাৎ বিনুর মেজদা বলে : তুমিই তো মা বিনুকে মেরেছে ভেবে দস্যি ছেলে বলে ওকে গালাগাল দিলে তখন।

হেসে মা বলেন : হাঁরে বোকা ছেলে, আমি দস্যি ছেলে বলেছি বলে কি আর সত্যিই সে দস্যি ? ওটা আমার মুখের একটা কথা।

মণি বলে : এঃ! ভারি অন্যায় হয়েছে মা তাহলে ওকে অমন করে মেরে ! খুব আফ্‌শোষ হয় মেজদার।

স্কুলের সময় বয়ে' যায়, রামু আসে না। নাওয়া-খাওয়া ফেলে বিনু এবাড়ি-ওবাড়ি খুঁজে বেড়ায় রামুকে।

ঘণ্টা দুয়ের পর শুক্‌নো মুখে ফিরে আসে বিনু। নাঃ, কোথাও পাওয়া গেল না রামুকে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে মেজদা ওঘরে ঘুমোচ্ছে বুঝি। বাড়িশুদ্ধ সবারই খাওয়া হয়েছে, খান-নি শুধু মা আর বিনু। কি করে' খাবে ? আহা, বেচারি রামু এখনো না খেয়ে কোথায় পড়ে রয়েছে !

কেঁদে বিনু মাকে জড়িয়ে ধরে। মার কোলে মুখ গুঁজে বলে : কি হলো মা রামুদার ?

মা বলেন : তাই তো, কি হলো ? তুই বাছা, কিছু মুখে দিয়ে তোর মেজদাকে সঙ্গে নিয়ে দেখতো। গাঁয়ের ভেতরে কোনো বাড়িতে সে আছেই।—গাঁ ছেড়ে চলে যায় নি কোথাও।

আদর করে বিনুর পিঠে হাত বুলোন মা। বিনু কিছুতেই কিছু মুখে দেবে না। মা জোর করে ওকে এক বাটী দুধ খাইয়ে দেন। তারপর মেজদাকে ডেকে দেন ওঘর থেকে। মেজদার সঙ্গে বিনু বেরিয়ে যায় রামুকে খুঁজতে।

পথে নিমাইবাবুর সঙ্গে দেখা, রামুদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই নিমাই-বাবু। নিমাইবাবু জিগ্যেস করেন: হাঁরে বিন্নু, রামুটা আজ স্কুলে যায়নি কেন? কি হয়েছে ওর?

মেজদা বলে: রামু আজ বাড়ি নেই, পণ্ডিতমশাই। সকাল থেকে পালিয়ে রয়েছে কোথায়।

নিমাইবাবু বলেন: আজ এইমাত্র হঠাৎ খবর এলো—ইন্সপেক্টর সাহেব আসছেন স্কুল দেখতে। রামু ক্লাসের সেরা ছেলে। ও ছাড়া সাহেবের কোনো প্রশ্নের নিখুঁত জবাব দেবার মতো ভাল ছেলে আমার ক্লাসে আর নেই। ফি বছর জলপানি পেয়ে আস্‌ছে ও। হেড মাষ্টারমশাই বলেন—'ওকে আমাদের চাই আজ'।—কোথায় গেল সে?

মেজদা বলে: ওকেই আমরা খুঁজতে বেরিয়েছি। পেলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব স্কুলে। আপনি ফিরে যান।

নিমাইবাবু ফিরে গেলেন।

বিন্নু বলে: জানো মেজদা, রামুদা তার জলপানির পয়সা থেকেই তো আমায় যতো সব জিনিস কিনে দেয়। গাঁয়ের অনেককেই দেয় সে।

কোনো জবাব দেয় না মেজদা।

ঃ এই যে বিনুদি' মণি, আমাদের রামুদা কই গা ? স্কুলে তো যায়নি আজ ?—ভিখিরী গদাবুড়ো শুধোয়। বিনু বলে ঃ না, আমরা দুজনেই আজ স্কুলে যাইনি। তুমি বুঝি এই স্কুল থেকে ফির্‌ছ ? গদা বলে ঃ হাঁ। ওরা বল্‌লে—আজ মোটেই সে স্কুলে যায়নি। কই এমনটি তো কোনো দিন হয় না। তাই খোঁজ নিতে এলুম।

মেজদা জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি কেন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ গদা ?

কি যেন জবাব দিতে চায় গদা। বিনু বলে ঃ রামুদা তার জলখাবারের পয়সা থেকে রোজ ওকে দুটো করে' পয়সা ভিক্ষে দেয়। তাইতেই তো ও রোজ রামুদার কাছে একবার করে' স্কুলে যায়। মেজদা নিজের পকেট থেকে দুটো পয়সা গদাকে দিয়ে দেয়। বলে ঃ রামু কোথায় রাগ করে' পালিয়ে গেছে গদা। তাকেই তো খুঁজছি আমরা।

পয়সা দুটো মাথায় ঠেকিয়ে গদা বলে ঃ তার জন্যে ভেবনি বাবু। আহা ! বড়ো ভাল ছেলে ! এই আমিও বেরুলাম তার খোঁজে। খুঁজে বার কর্‌তেই হবে তাকে·· ···

টল্‌তে টল্‌তে চলে যায় গদা আর একদিকে।

আরো খানিকটা এগিয়ে যেতেই বিনুরা দেখে বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিধে বাগ্দীর মা। কাছে যেতেই বিনুকে বলে: তোমার রামুদা স্কুল থেকে ফির্‌লে একবার এদিকে পাঠিয়ে দিও তো মা। একটু কাজ আছে।

বিনু বলে: না বাগ্দীপিসী, রামুদা ত আজ স্কুলে যায়নি। বাড়িতেও নেই। মেজদা মেরেছে বলে' কোথায় পালিয়েছে।

নিধের মা ব্যস্ত হয়: মেরেছে! আহা-হা, কেন মেরেছে? বড় লক্ষ্মীছেলে ওই রামু। অমন ছেলে হুটি হয় না! আজ ক'দিন ধরে নিধে আমার জ্বরে বেহুঁস। এ ঘরে নিধে, ওঘরে বৌ আর ছেলে। একা আমি কি করে হুদিক সামলাই? তোমাদের রামু তার ওই দলটি নিয়ে না এলে কি আর রক্ষে থাক্‌তো?

মেজদা শুধোয়: আজ কি রামু এসেছিল এখানে পিসি?

নিধের মা বলে: হাঁ, এসেছিল বৈকি! এই তো সকালেই রোগীদের ওষুধ আর পথ্যি এনে দিয়ে গেছে রামু। রোজই তো এনে দেয়।

মেজদা গম্ভীর হয়।
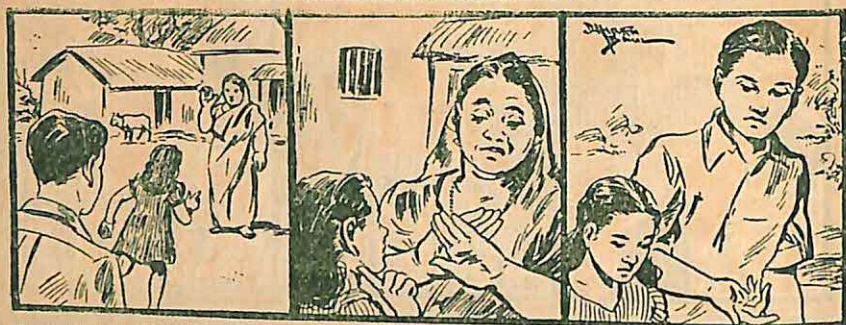
পথে বামুন খুড়ির বাড়ি। খুড়ি হাত তুলে ডাকেন বিন্নুকে।

খুড়ি বলেন : সন্ধ্যের দিকে রামুকে একবার আসতে বলবি ত' মা! মেয়ে-জামাইয়ের একটা চিঠি এসেছে, পড়ে শোনাতে হবে আমায়। তার জবাবও একটা ভেবে চিন্তে লিখে দিতে হবে।

বিন্নু বলে : রামুদা তো নেই, মেজদাকে পাঠিয়ে দেব কি ?

বামুন খুড়ি বলেন : না মা, ওসব কাজ মেজদাকে দিয়ে হবে না। আমরা মুখ্যু মানুষ, গুছিয়ে কি আর তেমন বল্‌তে পারি ? বাজে কাজে ওসব লোককে অমন খাটাতে নেই, মনে মনে বিরক্ত হবে। তুই রামুকেই পাঠিয়ে দিস। রামু আমার লক্ষ্মী ছেলে, কোনো মান-অভিমান নেই। ডাকলেই ছুটে আসে।

: আচ্ছা দেখি। ফিরে আসে বিন্নু মেজদার কাছে।

মেজদা বলে : আমি সব শুনতে পেয়েছি বিন্নু। সত্যিই, এই চিঠি লিখে দেওয়াতে শুধু নয়, রামুর মতো ধৈর্য নিয়ে এসব কোন কাজই আমরা করতে পারিনে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য—রামুর অনেক গুণ!

আবার এগিয়ে চলে দুজনে।

বেলা পড়ে' এসেছে। বটগাছের ছায়ায় মাঠের এদিকটা বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। বাগ্দীদের ছেলে লালু গরু চরাচ্ছে ওই ছায়ায় বসে'। বিনু আর মেজদা এগিয়ে যায় সে-দিকে।

বিনু শুধোয়ঃ আমার রামুদাকে দেখেছিস্ লালু?

লালু বলেঃ কেন, এই কিছু আগেই ত রামুদা ছিল এখানে। ওঃ! জানো বিনুদি, রামুদা না থাক্‌লে কেষ্টো আজ মরেই যেত নিশ্চয়। ওই হারু হতভাগা—কেষ্টোর সঙ্গে সে কী মারামারি! কেষ্টোর নাক ফেটে' ঝর্ ঝর্ করে' সে কতো রক্ত! রামুদা এসে হারুকে না ছাড়িয়ে দিলে কেষ্টোর কি আজ রক্ষে ছিল? মরেই যেতো কেষ্টো! তারপর রামুদা ওই হারু হতভাগাকে দিয়েই জল আনিয়ে ওর সেই রক্ত ধুয়ে' ওই দেখ জলপটী বেঁধে দিয়ে গেছে।—হেঃ রামুদাকে হারু খুব ভয় করে কি-না! আর কখ্‌খনো সে লাগ্‌তে যাবে না কেষ্টোর সঙ্গে দেখো!

মেজদা শুধোয়ঃ রামু ফের কোথায় চলে গেল বল্ তো?

লালু বলেঃ এই মাঠের পথ ধরেই ত' চলে গেল বাড়ীর পানে।

হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় লালু পথটা।

বিকেল বেলা। স্কুল থেকে ফিরে জল খাবার খেয়ে, কোদাল লাঠি ঝুড়ি কেনেস্তারা নিয়ে পথে বেরিয়েছে ছেলেরা।

বিন্নুকে দেখে কেলো বলে: হাঁরে বিন্নু, রামু ত আজ স্কুলে যায়নি। হেডমাষ্টার মশাই বলে দিলেন ইন্সপেক্টর সাহেব আজ আসতে পারেন নি, কাল আসবেন। রামু যেন কাল অবিশ্যি স্কুলে যায়।

মেজদা বলে: তোমরা এ সব নিয়ে কোথায় চলেছ?

ভুলু বলে: রামু যে কাল আমাদের বলে দিয়েছিল বকুলতলার জঙ্গলটা কেটে পরিষ্কার করে' ফেলতে। কতো সাপ পোকা-মাকড় থাকে ওখানে। রাত্তির বেলায় ওই পথে চলা ভয়। আর মাটী কেটে উঁচু করে বেঁধেও দিতে হবে পথটা—বর্ষায় জল জমে' থাকে ওখানে।

: আর ওই কেনেস্তারা?—ওটা কি জন্যে?—মেজদা শুধোয়।

নীলু বলে: এতে আছে কেরোসিন তেল। ওই যে ওই এঁদো ডোবাটা, ওটা ছিল কচুরি পানায় ভর্তি। কাল আমরা সব পানা পরিষ্কার করে' ফেলেছি। এবার কেরোসিন তেল ঢাললে ম্যালেরিয়া-মশার ডিম মরে' যাবে।

আর কিছু না বলে বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায় মেজদা আর বিন্নু।
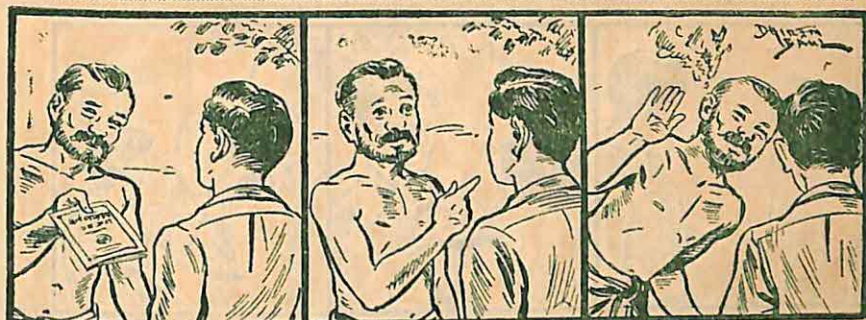
ঃ এই যে মেজদাদাবাবু, দেখ তো এ বইখানা চল্‌বে কিনা ? মধু-বাগ্দী এগিয়ে ধরে একখানা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ।

ঃ এ-ত দেখি একখানা প্রথম ভাগ। কে পড়্‌বে এ বই ? তোমার ছেলে গোবিন্দ বুঝি ?—মেজদা প্রশ্ন করে।

ঃ না—না বাবু, সে ত স্কুলে দুয়ের কেলাশে পড়ে। সে এ বই কবে শেষ করেছে। এ বই আমার জন্যে। বুড়ো মানুষ, মুখ্যু-সুখ্যু—লেখাপড়ার ধার ধারিনে কোনোকালে। তোমাদের ওই রামুদাদাবাবু লেগেছে এই বুড়োদের লেখাপড়া শেখাবে বলে'। সন্ধ্যেবেলায় একটা স্কুলও খুলেছে ওই ছিদেম মোড়লের আটচালায়। দিনের কাজকম্ম সেরে অনেকেই সেখানে শিখ্‌তে যায় লেখাপড়া। রামুদা যে-বই বলে' দিয়েছিল, দোকানে তা' ফুরিয়ে গেছে। দোকানী বল্‌লে—এতেও নাকি চল্‌বে।

ঃ হাঁ হাঁ, এতেও চল্‌বে। কিন্তু তোমাদের রামুদা যে কোথায় পালিয়ে গেছে মধু। তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে কোথাও।—মেজ্‌দা বলে।

ঃ সন্ধ্যেবেলায় ছিদেম মোড়লের আটচালায় তাকে পাবে। গরহাজ্‌রে একটি দিনও হবার যো নেই।—হেসে চলে যায় মধু।

বিনু আর মেজদা এগোয় বাড়ীর দিকে।

: বিন্নুদি ভাই, একটু দাঁড়াও না, রামুদাকে নিয়ে দুধ আনতে যাবো মহিম গয়লার বাড়ী।—পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকে বংশী।

বিন্নু শুধোয়: দুধ কি হবে বংশীদা?

: আন্নার মানৎ, আজ আমাদের বাড়ী নারায়ণ পূজো যে—

: কিন্তু রামু রাগ করে' কোথায় পালিয়ে গেছে।—মেজদা বলে।

বংশী মাথা নাড়ে, বলে: না না, এইমাত্র আমাদের বাড়ীতেই ছিল সে। যে গয়লার আজ দুধ দেবার কথা ছিল, হঠাৎ তার অসুখ বলে একটু আগে বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে সে। এখন এই অসময়ে মহিম গয়লাই একমাত্র ভরসা।

মেজদা বলে: তা, রামুকে সঙ্গে নেবে কেন?

: হ্যাঁ, আপনি জানেন না ওই মহিম গয়লাকে। এই অসময়ে রামুদা ছাড়া কেউ ওকে রাজী করাতে পারবে না। রামুদার কথা ফেল্‌তেই পারবে না মহিম। সেবার ওর ছেলেকে সেই বড় অসুখ থেকে কে বাঁচিয়েছিল? ডাক্তার শুধু অষুধ দিয়ে আর কি করতে পারতো? তদারক চাই না? শুশ্রূষা চাই না?—বংশী বলে।

তিনজনে এগোতে থাকে বাড়ীর দিকে।
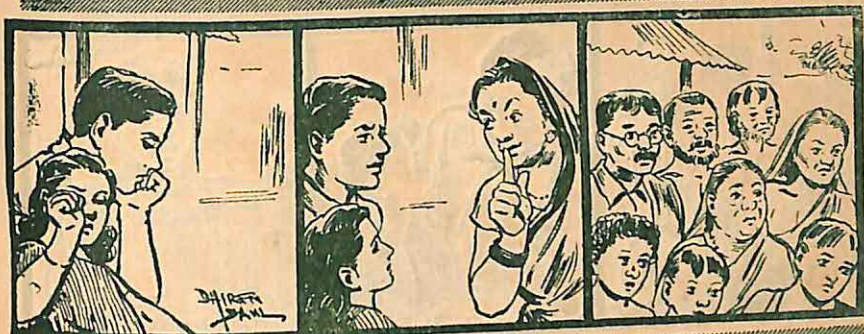
বাড়ীর উঠোনে ঢুকেই হতাশ হয়ে বসে পড়ে মেজদা। চেঁচিয়ে বলে : নাঃ মা, পেলুম না খুঁজে কোথাও রামুকে। সারাটা পাড়া তন্ন তন্ন করে এলাম।

ভীষণ অপরাধীর মতো বিনু এতক্ষণ চুপ করে মেজদার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, মাকে আসতে দেখে "ভ্যাঁ" করে কেঁদে ফেলে!

রান্নাঘর থেকে ওদের কাছে এগিয়ে এলেন মা—চাপা হাসিতে মুখখানি ভরা। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে নিচু গলায় বলেন : চুপ! ওই এসেছে রামু। আমি তাকে নাইয়ে-ধুইয়ে এইমাত্র খাওয়াতে বসিয়েছি রান্নাঘরে। কিন্তু বিনু এখনো কিছু খায়নি শুনে' বিনুর জন্যে পাতে বসে' অপেক্ষা করছে।

বিনুকে টেনে নিয়ে রান্নাঘরে গেলেন মা।

খানিক বাদেই দেখতে দেখতে রামুর দলের ছেলেরা, মধু বাগ্দীর স্কুলের লোকেরা, লালু-কেষ্টো সব রাখালেরা, নিধে বাগ্দীর মা, বামুন খুড়ি, এমন কি—পণ্ডিতমশাই নিমাইবাবু পর্যন্ত এসে রামুদের বাড়ি হাজির। সবাই প্রশ্ন করে : আমাদের রামু ফিরেছে কিনা।
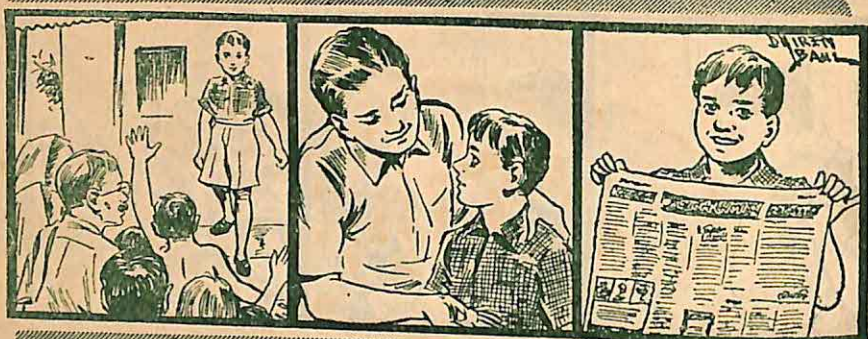
ততক্ষণে রামুর খাওয়া শেষ হয়েছে। মুখ ধুয়ে সে বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে। মুখে কথাটিও নেই।

রামুকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে' ওঠে সবাই : এই যে ফিরেছে আমাদের রামুদা—এই ত ফিরেছে আমাদের রামু!

হট্টগোলে বাড়ীখানা গম্‌গম্ করে' ওঠে। আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে রামুর মুখ।

একপাশে বসে' তন্ময় হয়ে এতক্ষণ দেখ্‌ছিল মেজদা এই সব। এবার ছুটে এসে জাপ্‌টে বুকে টেনে নেয় রামুকে। সবাইকে লক্ষ্য করে' বলে : তোমরাই ঠিক চিন্‌তে পেরেছিলে তোমাদের রামুকে। কিন্তু আমি তার দাদা—এতদিন সত্যিই একে চিন্‌তে পারিনি। আজ গোটা গাঁয়ের লোকের মুখে ওর সে-পরিচয় পেয়েছি।......কিন্তু রামু, এ শিক্ষা তুই পেলি কোথায়?

রামু তার জবাবে কিছু বল্‌লে না। শুধু একটুখানি মুচ্‌কি হেসে ঘর থেকে এনে সবাইকে দেখালে একটি জিনিষ!—সেটা কি?......শেষের ছবিটা দেখে বুঝে নাও।

কেমন, খুসী তো রামুকে তোমাদের দলে পেয়ে?

নন্টুর বন্ধু

জাতে কেউ নয়কো ছোট,
ভগবানের সৃষ্ট সবে।
সব মানুষের সমান আসন,
কেউ বা কেন তুচ্ছ হবে?
ভগবান তো মানুষ গড়েন,
মানুষ গড়ে সমাজটাকে,
ভগবানের সৃষ্ট মানুষ—
করতে কে চায় ক্ষুদ্র তাকে?

দৌড়ে ছুটে এলো ভুলু, একপাশ থেকে ছোট্ট করে' ডাকে : এই দাদা!—ইসারায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মোহনকে। নন্টু প্রথমে বুঝ্তে পারে না কি বল্তে চায় ভুলু। চেঁচিয়ে বলে : কি বল্বি বল্ না! ভুলু ইতস্ততঃ করে, তারপর একটু নিচু গলায় বলে : মোহন যে! হুই ঠাকুমা আস্ছেন। ছুটে ফের বেরিয়ে যায় ভুলু।

: সর—সর, রাস্তা থেকে সরে দাঁড়া তোরা, ছুঁয়ে দিবি।—গোবর জল ছড়াতে ছড়াতে ঠাকুমা আসেন। বড় ছুঁচিবাই ঠাকুমার। মোহনকে বাড়ীর ভেতরে দেখে থম্‌কে দাঁড়ান : ওটা কে মোহন না? ওকে নিয়ে ফের অন্দরে ঢুকেছিস্? এক্ষুনি না কাকে ছুঁয়ে দেয়। এই ভর সন্ধ্যেবেলায় আবার নেয়ে মরি!

মুখ কাঁচুমাচু ক'রে মোহন এসে নন্টুর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। হৈ হৈ করে' চেঁচিয়ে ওঠেন ঠাকুমা : যা বলেছি তাই! দিলি ত ছুঁয়ে নন্টুকে! মর এখন এই সন্ধ্যেবেলায় নেয়ে! পই পই করে' তোদের বারণ করে' দিইছি না?—যতো সব ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গে আনাগোনা। জাত ধম্ম গেল! গোবর জল ছড়িয়ে হিসেব করে' পা ফেলে ফেলে অন্দরে ঢোকেন ঠাকুমা।

মনে খু-উ-ব কষ্ট পেয়ে মোহন বলে : নন্টু আমি তো আসতে চাইনি ভাই! আসবার সময় ফুলীটাও বারণ করেছিল—'যাস্‌নি দাদা ওদের বাড়ী, ওরা সব উঁচু জাত, আমাদের ঘেন্না করে। নিচু জাত ব'লে বাড়ী গেলে দূর দূর করে।' নন্টুরও মনে পড়ে ফুলীর কথা। মোহনেরই ছোট বোন ফুলী।

ভারী অভিমানী আর তেজী মেয়ে ওই ছোট্ট ফুলী।

নন্টুই জোর ক'রে ধরে এনেছে মোহনকে। মোহনের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তার মধ্যে ফাঁক থাকবে, ভাবতেও পারে না নন্টু। পথ আগ্‌লে বলেছিল ফুলী: যেতে হবে না তোমার! ছোট জাত ব'লে আমাদের কুকুর-বেড়ালের চাইতেও বেশী ঘেন্না করে ওরা। কেন যাবো ওদের ওখানে? ওরা বাঁদর কুকুরকে ছোঁয়, কিন্তু আমাদের ছোঁয় না! বোন ফুলীর কথাগুলো মনে পড়তেই বুকটা ফুলে ওঠে মোহনের।

মোহনরা জাতিতে ডোম। ওর বাপ-মা ধামা-কুলো বুনে হাটে নিয়ে বিক্রী করে। তাতেই ওদের সংসার বেশ চলে যায়। জাতে ছোট হলেও মোহনের বাবা-মার আশাটা খুবই বড়। ছেলেমেয়েকে তারা পড়তে দিয়েছে স্কুলে। মোহনের সঙ্গে নন্টু এক ক্লাশেই পড়ে।

যেদিন মোহন স্কুলে এলো, ছেলেদের মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেলো সেদিন। ডোম বলে' মোহনের সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি কর্‌তে রাজী হয় না কোনো ছেলে। বস্‌তে চায় না মোহনের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে। মোহনের থেকে আলাদা থাক্‌তে চায় সবাই।

পণ্ডিতদার ধমক খেয়ে শান্ত হয় সব ছেলেরা। বুঝিয়ে দেন তিনি সবাইকে : আসলে ছোট জাত বড় জাত বলে কিচ্ছু নেই দুনিয়ায়। আমরা সবাই সমান। জাত ভগবান করে' দেননি, ওটা আমাদের তৈরী। তাই কোনো মানুষকে ছোট ভাবা মহাপাপ। ওতে ভগবান দুঃখ পান।

খুব গোঁড়া বামুনের ঘরের ছেলে আশীস, একটু মুখফোঁড়ও বটে। পণ্ডিতদার মুখোমুখি উঠে দাঁড়িয়ে সে প্রতিবাদ জানায় : যারা নিচু কাজ করে—ঘৃণার কাজ করে, তাদের সঙ্গে মিশতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় কি করে?

পণ্ডিতদা বলেন : ওরা তো আমাদেরি জন্যে এই নিচু কাজ করে আশীস! আমাদেরি তো সেবা করে ওরা।

আশীস বলে : তা হোক, তবু ত কাজটা নিচু!

পণ্ডিতদা সবাইকে বুঝিয়ে বলেন: তোমরা যখন ছোট ছিলে তোমাদের জন্যে তোমাদের বাবা-মা যে ধরণের সেবা করেছেন, সব মানুষের জন্যে ওরা ক'রে থাকে ঠিক সেই ধরণেরি সেবা। নিচু কাজ ক'রেছেন ব'লে বাবা-মাকে তোমরা যেমন ঘৃণা করতে পারনা, তেমনি উচিত নয় এদেরকেও ঘৃণা করা।

পণ্ডিতদা বলেন: মুচি-মুর্দোফরাস, কামার-কুমোর ধোপা-নাপিত তাদের জাত-ব্যবসার আড়ালে ক'রে থাকে গোটা সমাজেরি সেবা। সেই সেবার প্রতিদানে আমাদের শ্রদ্ধাই কি তাদের প্রাপ্য নয়? জাতে কি এসে যায়? পরিচ্ছন্নভাবে না থাকলে বামুনের ছেলেকেও ছুঁতে ঘৃণা হয়। যতই আমরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশবো এদের সঙ্গে, ততই হবে এরা মার্জিত। আর যতই রাখবো দূরে ঠেলে, ততই করবে এরা আলাদা জাতের সৃষ্টি—অস্পৃশ্য জাত। একটা গোটা জিনিষকে ভেঙ্গে কি আমরা করবো হাজারো টুকরো?

এসব কথা পণ্ডিতদা শুধু মুখেই বলেন না, কাজেও দেখিয়ে দেন। মোহনকে তিনি ছোঁন, তার হাত থেকে খাবার পর্যন্ত নিয়ে খান। অথচ পণ্ডিতদা খাঁটি বামুনের ছেলে, আর কত বড়ই না পণ্ডিতমানুষ তিনি।
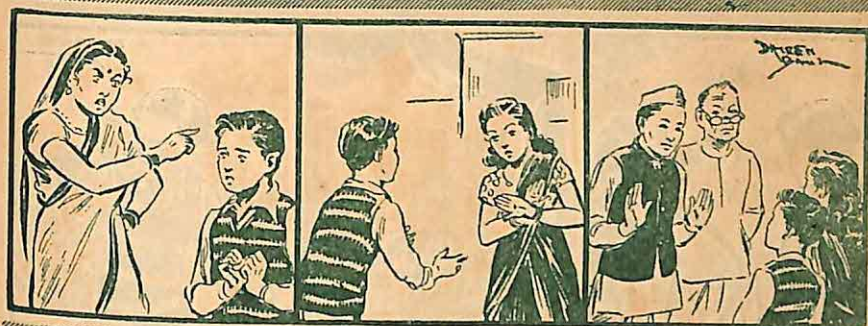
মোহনকে নিয়ে পড়্বার ঘরে ঢুক্তে যাবে নণ্টু, বড় ঘরে ডেকে নিয়ে মা বললেন ঃ জানো, এটা বামুনের বাড়ী। ওই পড়বার ঘরের পাশের কুঠরীতে পূজোর ঠাকুর রয়েছে না? মার কাছ থেকে পালিয়ে আসে নণ্টু।

ছোট কুঠ্রীটার সিঁড়ির ধারে যেখানে মোহন দাঁড়িয়েছিল, নণ্টু ফিরে এসে সেখানে আর পায় না মোহনকে। উঁকি মেরে ঘরের ভেতরটায় দেখে—সেখানেও নেই মোহন। নিশ্চয় তবে পালিয়েছে! মার কথাগুলো তবে শুন্তে পেয়েছে ও। ফটকের দিক থেকে আসে মিনু—নণ্টুর মিনুদি। বলে ঃ নাঃ, কিছুতেই আট্কাতে পারলাম না রে নণ্টু মোহনকে, হাত ফস্কে বেরিয়ে গেল। চোখ ছুটো দেখলাম জলে ভরা, ঠাকুমা নিশ্চয় বলেছে কিছু!

ছু' ভাই বোনে ফটকের দিকে এগোতেই দেখতে পায় ঠাকুরদা আর পণ্ডিতদা আস্ছেন এদিকে। পণ্ডিতদা বলেন ঃ যেতে দাও আজ মোহনকে, ওর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তুমি পরশু গিয়ে তোমার জন্মদিনের নেমন্তন্ন করে' আস্বে ওকে। আস্ছে পাঁচুই ত তোমার জন্মদিন? এসো, পড়বার ঘরে বসে আমরা সেদিনের প্ল্যানটা সব ঠিক করে' ফেলি। চারজনে এসে ঢোকে পড়্বার ঘরে।
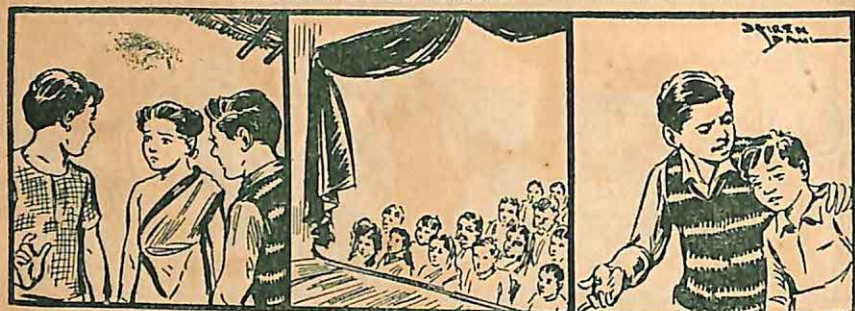
মাঘ মাসের পাঁচুই। নন্টুর জন্মদিন আজ। জন্মদিনের নেমন্তন্ন সব বন্ধুদের করে' এসেছে নন্টু, মোহনকেও করেছে। মোহন প্রথমটায় ইতস্ততঃ করছিল, বারবার চাইছিল—তুলীর দিকে। মোহনের বাবা-মা পণ্ডিতদার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই আস্‌তে রাজী হয়েছে মোহন। পাকা কথা দিয়ে দিয়েছে নন্টুকে।

বড় ঘরটায় আয়োজন করা হয়েছে জল্‌সার। একধারে তক্তপোষ পেতে উঁচু করে ষ্টেজ বাঁধা হয়েছে। সিল্কের রঙীন পর্দা ঝুলিয়ে সামনেটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। প্রকাণ্ড ফরাসে বসবে নিমন্ত্রিতেরা। মিনু নাচ্‌বে আরতি নৃত্য, আর ছোট্ট মেয়ে শীলা নাচ্‌বে সাঁওতালী নাচ। গান গাইবে—লীনা রেখা বাসন্তী আর যূথিকা। কার্তিকের কমিক আর মিহিরের ম্যাজিকের জন্যে সবাই সাগ্রহে বসে আছে। আবৃত্তি করে শোনাবে আশীস আর জয়দেব। বড় ঘরটা একেবারে ঠাসা।

সবাই এসে পড়েছে, এসে পৌঁছয়নি শুধু মোহন এখনো। ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ে নন্টু মোহনের জন্যে। খালি এঘর-ওঘর করে, আর পাঠিয়ে দেয় ভুলুকে মোহন আস্‌ছে কিনা দেখতে। শেষকালে মোহনই বুঝি মাটি করে' দেয় সব।

তাড়াহুড়ো করে সবাই ; জলসা আরম্ভ করে দিতে আর দেরী করা উচিত নয়। একটা ছেলের জন্যে ঘরশুদ্ধ সবাই অপেক্ষা করতে পারে না বেশীক্ষণ। মা বলেন : মোহন আসবে না, তোরা শুরু ক'রে দে। বাবাও বলেন সেই কথা। সবাই তাকায় পণ্ডিতদা আর ঠাকুরদার দিকে। ঠাকুরদা মাথা নিচু করে চুপ ক'রে বসে আছেন। পণ্ডিতদা বলেন : বেশ, তাই হোক।

নাচ শুরু হয় মিনুর। বড় ভাল নাচে ও। কিন্তু আজ যেন ওর পা দু'টো জড়িয়ে আসে, তাল কেটে যেতে চায় সব সময়। ভারী দমে গেছে মিনু ; নাচটা জুত্‌সই জমাতেই পারে না। মিনু ভাবতে পারে না মোহন করতে পারে এমন অভদ্রতা! এমন ক'রে ভেস্তে দিতে পারে তাদের সব প্ল্যান।

শীলার সাঁওতালী নাচের পর লীনা গান গেয়ে বেশ জমিয়ে দিলে আসর। কার্তিকের কমিক শুনে হাসির হর্‌রা পড়ে যায় সারা ঘরে। ম্যাজিক দেখিয়ে খুব বাহবা পেলে মিহির। সবচাইতে সুন্দর হ'লো আশীসের 'জন্মদিন' কবিতাটির আবৃত্তি। নণ্টুর জন্মদিন উপলক্ষে ওটা মোহনই লিখে দিয়েছিল। রেখার গানের পর জলসা ভাঙ্‌লো।

জল্‌সা শেষে খেয়ে দেয়ে একে একে সব ছেলেমেয়ে বাড়ী চলে গেল। ও ঘরে ডেকে পাঠান বাবা নণ্টুকে। খুব আদর ক'রে হাত বুলোন তিনি নণ্টুর গায়ে। বলেন ঃ মোহনের জন্যে মন খারাপ করো না নণ্টু, —ও না থাকলেও বেশ জমেছিল তো তোমাদের জল্‌সা!

মোহনের নাম শুনে খুব ক্ষেপে যায় নণ্টু। বলে ঃ তার জন্যে দুঃখু করি না বাবা! আমি আজ বুঝতে পেরেছি, ছোট জাতে আর বড় জাতে সত্যিই অনেক তফাৎ! ওদের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খেতে পারে না আমাদের। কথা দিয়ে তা রাখবার মত ভদ্রতা জ্ঞানটুকুও ওদের শিক্ষা নেই বাবা! উত্তেজনায় প্রায় কেঁদে ফেলে নণ্টু!

নিবিড় ক'রে বুকে টেনে নেন্ বাবা নণ্টুকে। বলেন ঃ নণ্টু, ছোট জাত আর বড় জাত—ওসব ঠিক আমি মানিনে। কিছুটা মানতে হয় তোমার মা ও ঠাকুমার জন্যে। ছোট জাত আর বড় জাত না মানলেও আমি মানি ছোটলোক আর বড়লোক। ছোটলোকদের নজর সতিই ছোট, ওদের সঙ্গে কক্ষনো মেশা উচিত নয় আমাদের। শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে তাতে……যাচ্ছো? বেশ যাও। একটা কথা আরো জেনে যাও নণ্টু—মোহন আজ এসেছিল তোমার নেমন্তন্নে!

চলে যাচ্ছিল নণ্টু, বাবার কথা শুনে থম্‌কে দাঁড়ায়। কাছে এসে প্রশ্ন করেঃ সত্যি মোহন এসেছিল বাবা? সত্যি বলছ? আমি জান্‌তাম নিশ্চয়ই আসবে সে! জানো বাবা, ও-বাড়ীর গণেশ ত আমাদেরি স্বজাত, বামুন,—মোহন গণেশের চাইতে অনেক ধর্মভীরু! আর ওই সেণ্টু, খুব বড়লোক ত ওরা,—মোহন সেণ্টুর চেয়ে ঢের ভদ্র! মোহনকে জানো না বাবা, কত বড় ওর মন! বন্ধুর প্রশংসায় নণ্টুর চোখমুখ উজ্জল হ'য়ে ওঠে! কথাগুলো খুব ভাবিয়ে দেয় বাবাকে!

তিনি বলেনঃ সত্যিই মোহন এসেছিল নণ্টু! তোমাদের জল্‌সা শুরু হবার অনেক আগেই এসেছিল সে। আমার হুকুমেই মহাদেব দারোয়ান তাকে ঢুক্‌তে দেয়নি অন্দরে। জানো ত, নিমন্ত্রিত ঐ সব ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের মাঝে বস্‌বে এসে একটা ডোমের ছেলে—এ তোমার মা-ঠাকুমা কেউ চান না, আমিও না।

অবাক হয়ে শুনে যায় নণ্টু। বাবা বলেনঃ দুঃখু করো না নণ্টু, আমরা তার সঙ্গে কোনো অভদ্র ব্যবহার করিনি। বাইরের ঘরে বসিয়ে মহাদেব তাকে খুব যত্ন করে' খাইয়েছে। বাড়ী অবধি সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছে,—মোহন এ সবের কিছুই বুঝতে পারে নি।
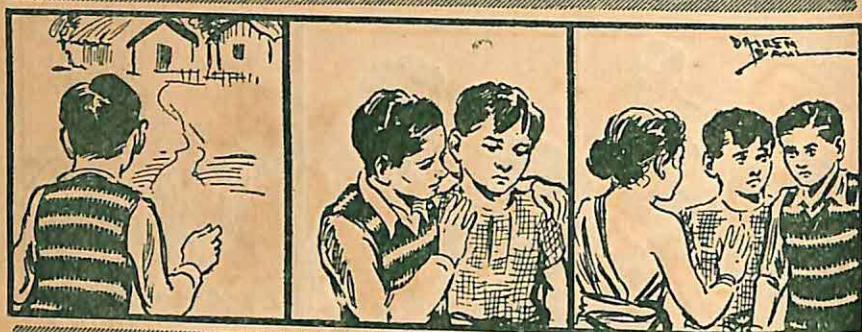
সে রাতে ভাল ঘুম হলো নণ্টুর। ভোরে উঠেই ছুটে চল্লো সে মোহনের বাড়ীর দিকে। লজ্জা আর সঙ্কোচে পা যেন চল্‌তে চায় না। মোহন বুঝ্‌তে পেরেছে সব, কিন্তু প্রতিবাদ ত কর্‌বে না সে। মোহনকে বেশ ভাল করেই জানে নণ্টু। শুধু তার ভয় মোহনের বোন ওই ছোট্ট দুলীকে।

দূর থেকে নণ্টুকে আস্‌তে দেখে কাছে এগিয়ে আসে মোহন। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে—কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। সব কথা মোহনকে গুছিয়ে বল্‌তে পারে না নণ্টু, শুধু বলে: তোকে পণ্ডিত-দার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি মোহন, চল্।

সর্বনাশ! ওই দুলী এদিকেই আস্‌ছে। মুখ শুকিয়ে যায় নণ্টুর! কিন্তু না, দুলী বেশ সহজভাবেই বলে: নণ্টুদা, এর জন্যে দুঃখু করো না ভাই! এ রকম যে হবে, এ তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এসব কাজে হাত দিতে হলে সমাজের যাঁরা নেতা,—তাদেরকেই এগিয়ে আস্‌তে হবে আগে। তোমার মতো ছোট ছেলেকে কেউ আমল দেবেনা। নিজেরা তৈরী না হয়ে ভবিষ্যতে এ রকমভাবে আর আমাদের মনে দুঃখু দিও না ভাই। আমরা এমনিতেই বেশ আছি।

নণ্টু ফিরে আসে পণ্ডিতদার বাড়ী। বুঝিয়ে বলে তাঁকে কাল্‌কের সব ঘটনার কথা—ঠিক যেমনটি সে শুনেছিল তার বাবার কাছে। তারপর বলে মোহনের কথা, তুলীর কথা। পণ্ডিতদা কান পেতে শোনেন সব। শুনে বলেন: তুলী সত্যি কথাই বলেছে নণ্টু। সমাজের এই গলদ ঘোচাতে হলে বড়দের এগিয়ে আসতে হবে আগে। ছোটরাও সঙ্গে থাকবে অবিশ্যি। তারপর নণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে চলেন তাদের বাড়ীর দিকে।

নণ্টুদের বাড়ীর পথে পলাশতলা। রাশি রাশি পলাশ ফুল ফুটে গাছ লাল হয়ে রয়েছে। পড়ে রয়েছে গাছতলায় অজস্র পলাশ। পণ্ডিতদা আশ্চর্য হয়ে দেখেন ঠাকুমা তার কুড়নো সাজি ভরা ফুলগুলি 'ওপর করে' ফেলে দিচ্ছেন নর্দমায়।

পণ্ডিতদা জিগ্যেস করেন: অমন সুন্দর টাট্‌কা ফুলগুলি কুড়িয়ে ফের ফেলে দিচ্ছেন কেন ঠাকুমা? ঠাকুমা বলেন: ছোট জাতের জ্বালায় কি আর পূজোর ফুল কুড়িয়ে শান্তি আছে। দিলে ছুঁয়ে ওই বাগ্দীদের মেয়েটা। কি আর করি? ও ফুলে ত আর ঠাকুর পূজো চল্‌তে পারে না।
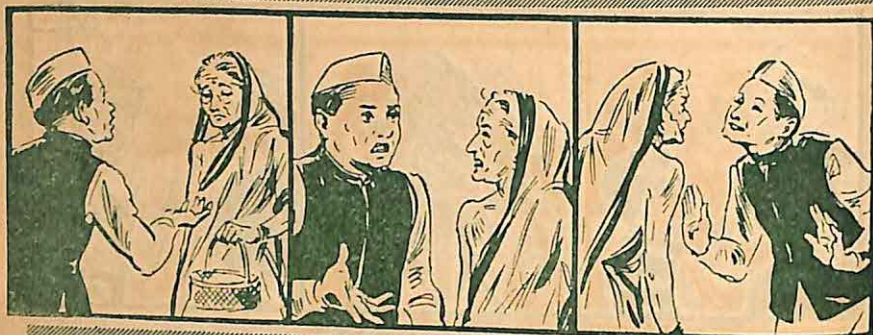
পণ্ডিতদা বলেন : বাগ্দীতে যখন ছুঁয়ে দিয়েছে, তখন আপনাকেও স্নান করতে হবে নিশ্চয়। সাজিটা বরং রেখে যান, ওটা ধুয়ে নিয়ে আমি আর নন্টু ওতে ততক্ষণ আপনাকে ফুল কুড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ঠাকুমা, তার আগে একটা কথার জবাব দিয়ে যাবেন কি ?

ঠাকুমা জিগ্যেস করেন : কি সে কথা ? পণ্ডিতদা বলেন : ভগবান কি এক ? অথবা প্রত্যেক জাতের জন্যে আলাদা আলাদা ভগবান আছেন ঠাকুমা ? যেমন ধরুন ডোমেদের ভগবান, বাগ্দীদের ভগবান, বামুনদের ভগবান....? ডোমেরা পূজো করলে সে-পূজো নেন ডোমেদের ভগবান। বাগ্দীরা পূজো করলে নেন বাগ্দীদের ভগবান। আর বামুনরা পূজো করলে নেন বামুনদের ভগবান ! বড় জাতের জন্যে বড় ভগবান, আর ছোট জাতের জন্যে ছোট ভগবান।

ঠাকুমা বলেন : তা কেন হবে ? ভগবান ত এক। পণ্ডিতদা ব'লেন : তাহলে ডোম-বাগ্দী সব ছোট জাতেরা যখন নিজেরা ফুল দিয়ে ঠাকুর পূজো করে, আর সে পূজো যদি আপনাদের ভগবানই নিয়ে থাকেন, তখন একটা বাগ্দী মেয়ের ছোঁয়া ফুলের পূজো কি এবারও ভগবান নিতেন না ঠাকুমা ?
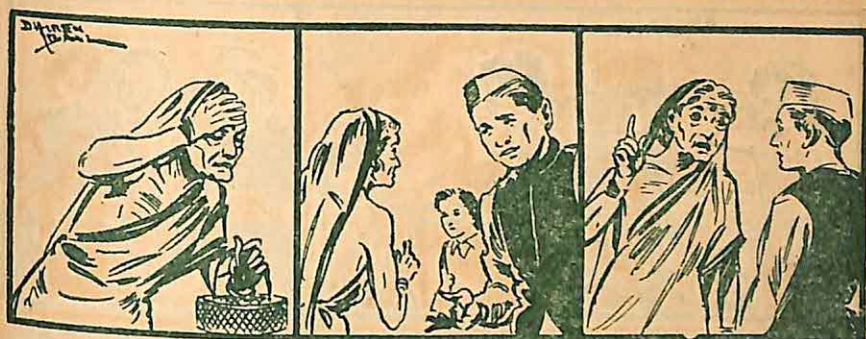
হঠাৎ যেন ঠাকুমার চোখ খুলে গেল। লজ্জিতভাবে বলেনঃ এই দামী কথাগুলো একটু আগে শুনতে পেলে আর অনর্থক ফুলগুলো ফেলে দিতাম না। আর বেচারী ওই মেয়েটাকেও মিছিমিছি অমন গালাগাল দিতাম না। সত্যিই ত, আমরা যে ভগবানের পূজো করি, ওরাও ত সেই ভগবানেরই পূজো করে। ওদের ছোঁয়া আমাদেরি ভগবান নেন—এ জেনেও বাগ্দীতে ছুঁয়েছে বলে ফুল ফেলে দেওয়া আমার ভুল। সত্যিই খুব অনুতাপ হচ্ছে আমার!

পণ্ডিত দা বলেনঃ বেশ ত ঠাকুমা, আসছে তিরিশে মাঘ সরস্বতী পূজো। সেদিন এদের সবাইকে নিজেদের সমান ভেবে কাছে ডেকে নিয়ে আসুন আমরা দেবীর পূজো করি, আর করি আমাদের এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত! খুশী মনে ঠাকুমা বলেনঃ বেশ তাই হোক! পণ্ডিতদা নণ্টুকে বলেনঃ নণ্টু, মোহনকে সত্যিকারের বন্ধুরূপে পাবার এই তোমার সুযোগ এসো, তারি আয়োজন করি আমরা!

হুঁ—উঁ—উঁ!—রাস্তার ওদিকে পাৎকোর ধার থেকে ভেসে আসে কান্নার আওয়াজ! ঠাকুমা বলেনঃ কাজলীর কান্না, ও-ই ছুঁয়ে দিয়েছিল আমার ফুলগুলো।

কাজলী—বাগ্দীদের ছোট্ট মেয়ে কাজলী। আহা! কি করে' যেন ওর ছোট মেটে কলসিটা ভেঙে গেছে, তাইতো সে কাঁদে। কাজলী বলেঃ সত্যি পণ্ডিতদা, পাৎকো আমি ছুঁইনি মোটেই! তবু আশীসদা দিলে আমার কলসিটা ভেঙে! উঁ—হুঁ—উঁ! কলসির শোক সামলাতে পারে না কাজলী।

আশীস বলেঃ আমি নিজে দেখেছি তোকে ছুঁতে। জানিস্, এই পাৎকোর জল বামুন কায়েতরাও খেয়ে থাকে? পণ্ডিতদা বলেনঃ ওর ছোঁয়াতে পাৎকো অশুদ্ধ হয়নি আশীস, এখনো তারা খাবে এই জল!

পণ্ডিতদা বুঝিয়ে বলেনঃ কেউ অপবিত্র হলে জলের স্পর্শেই শুদ্ধ হয়। অপবিত্রের ছোঁয়ায় জল যদি অপবিত্রই হবে, তবে আর লোকে কেন অপবিত্র হলে জল ছুঁয়ে বা জলে নেয়ে পবিত্র হতে চায়? সুতরাং জেনে রেখো—কাজলী ছুঁয়েছে বলে গোটা পাৎকোর জলই অপবিত্র হয়ে যায়নি আশীস। ও-জল আমরা এখনো সবাই খাবো। আমরা শুধু নজর রাখ্‌ব পানীয় জলকে কেউ নোংরা বা দূষিত না করে। তাহলে, বামুন বা বাগ্দী কারুরই ক্ষমা নেই। ঠাকুমা বলেনঃ এ সব খুব সত্যি কথা!
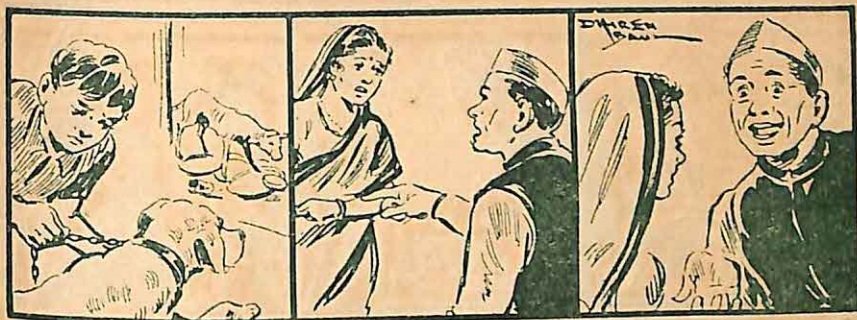
শোবার ঘরটার মেঝেতে বসে' টমিকে আদর করে ভুলু। শেকল টেনে ধরে রাখ্‌তে পারে না। আস্তাকুঁড়ের এঁটো বাসনগুলো চাটছে একটা ঘেয়ো কুকুর, টমির আস্ফালন তারি ওপর। ছেড়ে দিলে এখুনি ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়বে তার ওপর।

পণ্ডিতদা প্রশ্ন করেন মাকে: কুকুরটাকে দিয়েছেন আপনি ওই ঘরে ঢুক্‌তে, অথচ কাল মোহনকে ত ঢুকতে দেননি ওখানে! মা বলেন: ও ঘরে কুকুরকে ঢুক্‌তে দেওয়া হয় না সত্যি!.... তবে ওটা বিলিতী কুকুর কিনা, তাই বোঝাতে পারি না ছেলেমেয়েদের। কথা শোনে না। ওরা বলে—বিলিতী কুকুরকে নাকি সবাই ঘরে ঢুকতে দেয়। পাশের বাড়ীতে নাকি ওরা বিছানায় পর্যন্ত উঠতে দেয় ওদের কুকুরকে। খুব দামী কুকুর ওদের, আলসেশিয়ান। আমাদের কুকুরটাও ত কম দামী নয়! আসল বিলিতী কুকুরের বাচ্ছা।

খুব হাস্‌তে থাকেন পণ্ডিতদা: এতদিন শুনেছি মানুষের মধ্যেই শুধু নানা জাত আছে, এখন দেখছি কুকুরদেরও জাত বেঁধে দিয়েছেন। উঁচু-নীচু, দিশী-বিলিতী, আসল-নকল সস্তা-দামী, আলসেশিয়ান-স্পেনিয়েল! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

পণ্ডিতদা বলেনঃ আচ্ছা, ওই ঘেয়ো কুকুরটা আস্তাকুঁড়ের বাসনগুলো চাটছে, ধুয়ে মেজে ফের ওই বাসনগুলোতে ত আপনারা ভাত খাবেন? ওতে কুকুরে খেয়েছে বলে ত আর ফেলে দেবেন না একেবারে?

মা বলেনঃ আস্তাকুঁড়ের এঁটো বাসন কুকুরেরা খেয়েই থাকে, সে কি আর কেউ ফেলে দেয়?

পণ্ডিতদা বলেনঃ সত্যি কথা! কেউ সে-বাসন ফেলে দেয় না। কিন্তু মোহনকে নিশ্চয়ই ওই বাসনে কখনো খেতে দেবেন না, যাতে একটা ঘেয়ো কুকুর খেয়ে যাচ্ছে! মোহন খেলে সে-বাসনে নিশ্চয়ই আপনারা আর কখনো খাবে না। মোহনকে কুকুরের চেয়েও ছোট ভাবেন কি?

পণ্ডিতদা ফের বলেনঃ টমিকে আপনাদের শোবার ঘরের ভেতরে ঢুক্‌তে দিয়েছেন বিলিতী কুকুর বলে; কুকুরের চেয়ে বড় জাত—মানুষ জাত বলে—মোহনকে যদি কাল ওই ঘরে ঢুক্‌তে দিতেন, তবে পৃথিবীর একটা খুব বড় উপকার করতেন আপনারা। প্রত্যেক সমাজেই এ ধরণের অনেক নিয়মই চালু আছে, যেগুলির পরস্পরের ভেতরে কোনো সংগতি নেই। একটার বেলার যা বলে, অন্যটার বেলায় বলে তার ঠিক উল্টো। একটু হিসেব করে দেখলে, আমরা এ ভুল সহজেই ধরতে পারি।

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে তাকে মিনু : মা, থালা থেকে খাবার নিয়ে পালালো কাকে! ছুটে গেলেন মা, বেশ ভৎর্সনা করলেন মিনুকে। থালার যে ধার থেকে খাবার নিয়ে পালিয়েছে কাকে, সে দিকটা থেকে কিছু খাবার ভুঁইয়ে ফেলে দিলেন মা।

পিছু পিছু পণ্ডিতদা এসেছিলেন। পণ্ডিতদা বলেন : দেখুন, কাকে ছোঁ মেরে কিছু উঠিয়ে নিলে ঠিক ঐ রকমভাবেই অনেকে সে ধার থেকে কিছুটা খাবার ফেলে দেয়। বাকিটা সবাই মিলে খায়। কেউ আপত্তি করে না। কিন্তু যদি মোহন নিত? তাহলে নিশ্চয়ই একধার থেকে কিছুটা খাবার ফেলে দিয়ে বাকিটা সবাই মিলে খেতেন না।

মা বলেন : না, সব খাবারই ফেলে দিতাম তা হলে! ওরা যে ছোট জাত, কতো কি অখাদ্য-কুখাদ্য খায়! পণ্ডিতদা বলেন : স্বাস্থ্যের কথা না হয় না-ই তুললাম, অখাদ্য-কুখাদ্যের বিচার কি কাকেদের চেয়েও মোহনের কম? একটা নোংরা পাখীর অধিকারও কি মোহনের নেই?

কোনও জবাব দিতে পারেন না মা। শুধু বলেন : এই নিয়মই যে চলে আস্‌ছে। চিরকালই দেখে আসছি এই নিয়ম।

পণ্ডিতদা বলেন : এ নিয়ম আর চলতে দেওয়া উচিত নয়!
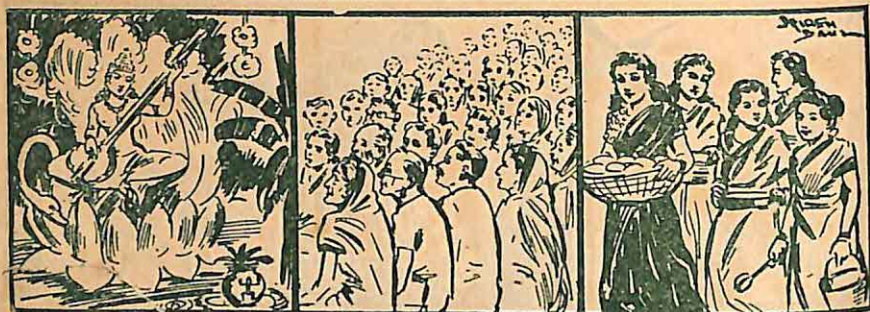
আজ তিরিশে মাঘ। নন্টুদের স্কুলে সরস্বতী পূজো আজ। পণ্ডিত-দার ডাকে এবার বিশেষ করে সবাই এসে পূজোয় যোগ দিয়েছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা ত এসেছেই, তাছাড়া এসেছে গাঁয়ের সবাই। স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-গরীব, বামুন-বাগ্দী কেউ বাদ যায়নি। স্কুলের মাঠটা—লোকে গিজ্ গিজ্ করছে।

শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই আসেনি, এসেছেন নন্টুর ঠাকুরদা-ঠাকুমা বাবা-মা। এসেছেন আশীসদের বাড়ির, মিহিরদের বাড়ির, জয়দেবদের বাড়ির সবাই। এসেছে মোহন-তুলী মোহনের বাবা-মা এবং ওপাড়ায় সবাই। পণ্ডিতদার ডাকে সবাই এসেছে এক সঙ্গে দেবীর পায়ে অঞ্জলি দেবে বলে।

পূজো শেষে সবাই চেঁচিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে অঞ্জলি দেয় দেবীর পায়ে। এর পর প্রসাদ বিতরণের পালা। ফলমূল ত আছেই, আরো আছে খিচুড়ী, লুচি ও মিষ্টি। পরিবেশন করছে মিনু, যুথিকা, লীনা, বাসন্তী। কিন্তু ওকে? ওদেরি পাশে খিচুড়ীর বালতি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুলী না?

পণ্ডিতদার ব্যবস্থা এসব।

পণ্ডিতদার এতটা বাড়াবাড়ির জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে যে-যার আসন দখল করে' নিয়েছে। মুস্কিলে পড়েছেন বড়রা। শুধু ফলমূল হলেও বা হতো, আছে লুচি-খিচুড়ী আর মিষ্টি। কি করা যায় ভেবে পান না তাঁরা, এ ওর মুখের পানে তাকান শুধু! কেউ এগিয়ে এসে বাধা দিতেও পারেন না, অথবা সবার আগে গিয়ে আসন দখল করতেও ইতস্ততঃ করেন। মহা সমস্যায় পড়েছেন বড়র দল।

সবার ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসেন ওই কে? নন্টুর ঠাকুমা যে! সঙ্গে নন্টুর ঠাকুরদাও আছেন। ঠাকুমা বলেন: এতদিন যখন মিথ্যা ধর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে এসেছি, তখন সত্যিকারের ধর্মকে মান্‌তে এবার আমার কোনো ভয় নেই।

সামনের একটি আসন দখল করে' বসে পড়েন ঠাকুমা। ঠাকুরদাও আছেন সঙ্গে। এতক্ষণে চমক ভাঙে সবার। দেখতে দেখতে সব আসন-গুলো ভর্তি হয়ে যায়। বাদ পড়ে না কেউ। তারপর দেখতে দেখতে খালি হয়ে যায় পাত। ফের নতুন করে প্রসাদ আসে। চেয়ে নিয়ে সবাই খায়। ছেলে-বুড়ো, ধনী-গরীব, বামুন-বাগ্দী সবাই।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পণ্ডিতদার মুখ। বলেন ঃ দেশ এবং জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে' যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সত্যিকারের আনন্দ ও তৃপ্তি কি আছে সে স্বাধীনতায়? আসুন বিচ্ছিন্ন এই জাতিকে ফের জুড়ে দেবার ব্রত নিয়ে আজ থেকেই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হোক।

নন্টুর বাবা-মারাই শুধু নন, আশীসদের, মিহিরদের, জয়দেবদের বাড়ীর সবাই মহানন্দে প্রসাদ খাচ্ছেন। ওদিকে নন্টুর ঠাকুমার কাছে খিচুড়ীর বালতিটা এনে দুলী শুধোয় ঃ ঠাকুমা?

ঠাকুমা একবার মুখ তুলে দুলীর পানে চান, তারপর উৎসাহের সঙ্গে বলেন ঃ দে দে, আরো প্রসাদ দে আমায়। তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন ঠাকুরদার পাত।

ঠাকুরদার পাতে দু'হাতা খিচুড়ী তুলে দেয় দুলী। মুখ নিচু করে শুধু খেয়ে চলেছেন ঠাকুরদা।

এরপর একদিন দেখা গেল নন্টু আর মোহন বেশ গলা জড়াজড়ি করে' পথ চলেছে। খুব নিবিড় করে' জড়িয়ে ধরেছে দুজনে দুজনকে। দুটি বন্ধুর মাঝে আর এতটুকুও ফাঁক নেই!

শ্রীমান গৌরচন্দ্র

উপদেশে নাহি যদি
হয় হিতাহিত বোধ,
ভুল পথে চলা যদি
কখনো না হয় রোধ,
জগতের জীবলোকে
দেখে নাও নিজ চোখে,
শিখিবে অনেক কিছু
মিশিয়া তাদের সাথে—
যাদের কাহিনী পড়
তোমার পুঁথির পাতে॥

গোরাকে যে একবার দেখেছে, সে আর ভুল্‌বে না—ভারী একগুঁয়ে ছেলে। কোনও কিছু উপদেশ দিতে যাও, শুন্‌বে না। ভালো কথা বোঝাতে যাও, কানেই নেবে না। অথচ রোজ রোজ তার ওই বিশ্রী স্বভাবের ফল তাকে হাতে হাতেই পেতে হয়।

গোরা ভাবে সবাই অন্যায় করে' তাকে এই ফলটা পাইয়ে দিলে। আসলে তার পাওয়া উচিত ছিল পুরস্কার !

বড়রা কোথাও হয়তো নিজেদের ভেতরে কোনো জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। কোথা থেকে গোরা ছুটে এসে ডেঁপোমি করে সেই আলোচনায় যোগ দেয়। কেউ বাধা দিয়ে ভাগিয়ে দিলে—রাগে গোঁ-গোঁ করে ফুল্‌তে থাকে।

গোরার পিসিমার অনুরোধে গোরার কোনো বন্ধু হয়তো একটা গান গেয়ে শোনাচ্ছে। গোরা হঠাৎ কোথা থেকে এসে গায়ে পড়ে সেই গানের একটা কলি নিজেই গাইতে শুরু করে দিলে। গানটা একদম মাটি হয়ে গেল। গোরা ত আর গান জানে না। স্থান কাল পাত্র ভুলে পাগলামি—ছ্যাবলামি আর একগুঁয়েমির চূড়ান্ত দেখিয়ে ছাড়ে গোরা। সবাইকার কাছে গোরা একটা গেরো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমনিধারা কতো রকমের দোষ যে গোরার আছে, তা' বলে শেষ করা যায় না। গোরার মা বললেনঃ ইস্কুল থেকে ফিরলে, এই পয়সা নিয়ে দোকান থেকে চিনি কিনে আনো, তোমাকে দুধভাত খেতে দেবো। গোরা সে কথায় কান না দিয়ে ছাতে গেল ঘুড়ি ওড়াতে। মায়ের ডাকে সাড়াই দিলে না গোরা।

ইস্কুলের মাঠে আজ তাদের ফুটবল ম্যাচ। হঠাৎ খেয়াল হতেই মাকে এসে বলে গোরাঃ শিগ্গীর দুধভাত দাও, মাঠে যাবো।...দুধভাত মুখে দিয়েই তাতে চিনি নেই বলে গোরার নাকি কান্নাঃ এ আমি খাবো না, এ আমি খেতে পারবো না! কাঁদতে কাঁদতে দুধভাত ফেলে মাঠের পানে ছুটলো গোরা।

খেলা শুরু হতে আর দু মিনিট বাকি। হাঁপাতে হাঁপাতে মাঠে তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো গোরা। সবাই অপেক্ষা করছে, রেফারীর বাঁশি পেলেই খেলা শুরু হবে এখুনি। ওদিকে গোরা একাই বল নিয়ে মিথ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। সবাই বিরক্ত হয়। বলেঃ থামো গোরা থামো, বলটা সেণ্টারে দাও। গোরা কি কারো কথায় কান দেয়? এই সব দোষেই ত কেউ তাকে দু চক্ষে দেখ্তে পারে না।

অথচ এর জন্যে গোরা তার মা-বাবা দাদা-দিদি এমন কি মাষ্টারমশাইয়ের কাছে কত রকম উপদেশ, ভর্ৎসনা আর শাসন পেয়েছে, তার সীমা নেই। গোরার সে সব গা-সওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব হজম করে ফেলে গোরা।

গোরার মাষ্টারমশাই গাদা গাদা ভালো ভালো উপদেশমূলক বই এনে পড়তে দেন গোরাকে। তাদের আশা যে, এ সব বই পড়ে গোরা অনেক কিছু শিখবে। তার এই বদ স্বভাব পাল্টাবে। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং। গোরা যেমনকে তেমনি। গোরার স্বভাব একটুও পাল্টায় না। মন দিয়ে পড়েই না গোরা সে সব বই।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন গোরার মাষ্টারমশাই। হাল ছেড়েছেন মা-বাবা দাদা-দিদি সবাই।

কিন্তু এমন যে গোরা, সত্যিই একদিন তার স্বভাব বেমালুম পাল্টে গেল। গাদা গাদা ভালো ভালো বই পড়ে যা হয় নি, গোরার মা-বাবা দাদা-দিদি মাষ্টারমশাইয়ের উপদেশ যে অসাধ্য সাধন করতে পারে নি, হঠাৎ কি করে আপনা থেকেই তা হয়ে গেল—সেটাও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

একদিন রাতে শুয়ে শুয়ে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে গোরা। দেখে, প্রকাণ্ড এক বটগাছের মগডালে একটা ছোট্ট পাখির বাসা। ডিম ফুটে তিন চারটে ছানা হয়েছে পাখিটার। ছানাদের জন্যে পাখিটা নানা রকম পোকা মাকড় ঠোঁটে করে নিয়ে এসে খাওয়ায়।

সেদিন পাখিটা একটা ছোট্ট পিঁপড়ে ঠোঁটে করে এনেছে ছানাদের খাওয়াবে বলে। হঠাৎ গোরা শুনতে পায় পিঁপড়েটা চিঁচি করে বলছে : আমায় বাঁচাও! আমাকে তোমার ছানাদের খেতে দিও না। আমাকে ছেড়ে দাও! বাঁচাও আমাকে!

আশ্চর্য! পিঁপড়ের এই কাতর প্রার্থনায় পাখির মনে দয়া হলো। সে পিঁপড়েকে ছেড়ে দিলে। ছাড়া পেয়ে যাবার সময় পিঁপড়ে পাখিকে বলে গেল : তোমার এ-দয়া আমি জীবনে ভুলব না।

পাখি কিন্তু মোটেই বিশ্বেস করেনি সে-কথা। ক্ষুদ্র এক পিঁপড়ে। সে আর কি উপকার করবে তার? একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে অন্য কোনো খাবারের সন্ধানে পাখিটা ফের ডানা মেলে দূরে মাঠের দিকে উড়ে গেল।

শ্রীমান গৌরচন্দ্র

এর কয়েক দিন পর এক ভীষণ কাণ্ড! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ ডাল বেয়ে এসেছে পাখির বাসার কাছে। মতলব, ছানাগুলিকে সাবড়ে দেবে! সাপটাকে দেখে ছানাগুলির যা অবস্থা! পাখিটা গেছে আহারের সন্ধানে। মা কাছে নেই; ছানাগুলো পরিত্রাহি চীৎকার করছে: কে আছ বাঁচাও!

ব্যস! আর কথা নেই। নিমেষে ভেল্কীবাজি খেলে গেল। সাপটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ডাল থেকে একেবারে পপাত ধরণীতলে। কোথা থেকে বিরাট এক পিঁপড়ের দল এসে ছেঁকে ধরেছে সাপটাকে। তারপর দেখতে দেখতে সাপটার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি! সেই পিঁপড়েটা এইভাবে প্রত্যুপকার করে পাখির ছানাগুলোকে রক্ষা করলে।

স্বপ্নটা গোরার বেশ ভালই লেগেছিল। মাষ্টারমশাই গোরার মুখে সব শুনে এর সারমর্ম বেশ ভাল করে গোরাকে বুঝিয়ে দিলেন—পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্র একটা জীবও উপকারীর উপকার কর্‌তে পারে। আরো বুঝিয়ে দিলেন—সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকলে বিরাট শত্রুকেও অনায়াসে পরাভূত করা যায়। স্বপ্নে-দেখা গল্পটার এই সারমর্ম জীবনেও ভোলেনি গোরা।

আর এক রাতে ঘুমের ঘোরে গোরা স্বপ্ন দেখলো। তাদের ভাঁড়ার ঘরের এক কোণে একটা পাকা কলা পড়েছিল।

কুটুস্—কুটুস্—কুটুস্! দুটো ইঁদুর খাবার খুঁজ্‌তে খুজ্‌তে সেই কলার কাছে এসে হাজির। হঠাৎ কলাটা দেখতে পেয়ে দুজনেরই ভারী আনন্দ! কিন্তু কলাটা খাবে কে? এ বলে আমি সবটা খাবো। আমি আগে পেয়েছি। ও বলে আমিই একা খাব সবটা। আমার গায়ে শক্তি বেশী।

প্রথমে শুরু হলো তর্ক, তারপর ঝগড়া।

অবশেষে দুজনে বেধে গেল মারামারি। কামড়া-কামড়ি আঁচড়া-আঁচড়ি রক্তারক্তি! অনেকক্ষণ কেউ কাকেও হারাতে পারে না। শেষ অবধি সাদা ইঁদুরটা গেল হেরে।

হেরে গিয়ে সে ডেকে নিয়ে এলো একটা হুলো বেড়ালকে। বললে : হুলো ভাই, তুমি কেলোকে সাজা দাও। ও আমার ঘোর শত্রু! ওকে তুমি খেয়ে ফেলো!

হুলোর ত মজা! তার খাদ্যই ত ইঁদুর। সে তক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে কেলোর ঘাড় মটকালো। সাদা ত মহা খুশী!

সাদা ইঁদুরটা কেলোর দশা দেখে খুব আনন্দ করতে লাগল : কেমন জব্দ! আর লাগবি আমার সঙ্গে ?

একটা ইঁদুরে হুলোর পেট ভরবে কেন ? সাদা ইঁদুরটার জন্যেও তার নোলার জল এসে গেছে। ভাবলে—একেই বা ছাড়ি কেন ?

শত্রুকে মেরে তার অপমানের শোধ নিয়ে দিয়েছে বলে সাদা ইঁদুর হুলোকে তার বন্ধু বলে ধরে নিয়েছে! সে হুলোর খুব কাছে এসে বসে আনন্দ করছে। বাগে পেয়ে হুলো তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়লো সাদা ইঁদুরটার ওপর। তারপর দুটো ইঁদুরে পেট ভর্তি করে—আস্তে আস্তে নিজের কাজে চলে গেল।

পরদিন মাষ্টার মশাইকে গোরা স্বপ্নের ব্যাপারটা সব বললে। শুনে মাষ্টার মশাই এর সারমর্ম গোরাকে বুঝিয়ে দিলেন।—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে যে মূর্খ অপরকে জব্দ করবার জন্যে বাইরের শত্রুকে ডেকে আনে, পরিণামে সেই শত্রুর হাতে তার নিজেরও ওই একই দশা ঘটে। গোরা মন দিয়ে মাষ্টার মশাইয়ের কথা শোনে এবং স্বপ্নে-দেখা সাদা ইঁদুরের দৃষ্টান্ত থেকে ভবিষ্যতে সাবধান হয়।

এক রাতে গোরা স্বপ্ন দেখে—তাদের বাগানেব ধারে জলায় যে রাজহাঁসগুলো চরতে আসে, তাদের একটা এসে পাকড়াও করেছে তাদের নতুন বাড়ীর রং-মিস্ত্রিকে। বলে ঃ মিস্ত্রি ভাই, তুমি আমার গায়ে মাথায় ডানায় পালকে এমন সুন্দর রং লাগিয়ে দাও, যেন কেউ আমাকে সাধারণ রাজহাঁস বলে আর চিন্‌তে না পারে। তোমাকে আমি পাঁচটা টাকা দেবো।

মিস্ত্রি ত হাঁসের কথা শুনে অবাক! সে হাঁসের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা তক্ষুনি আদায় করে নিলে। তারপর একটু মুচকি হেসে তার রঙের বাক্স খুলে লাল নীল সোনালী সবুজ নানারকম রঙ তার কথামত গায়ে মাথায় পালকে ডানায় বেশ করে লাগিয়ে দিলে। রাজহাঁসটার জৌলুস ঢের বেড়ে গেল।

অন্য রাজহাঁসগুলো তাকে দেখে ত অবাক! বাঃ! কী সুন্দর এর পালকের রং। সবাই বলে—এস একে আমাদের রানী করি। রঙীন রাজহাঁসটা ত এ-ই চায়। সেও তখন গর্বভরে হেলেদুলে তাদের দেওয়া সিংহাসনে রানী সেজে বসলো। তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো রানীর মুকুট!

রাণীকে নিয়ে সবাই খুব আনন্দ করছে! একদল গান ধরেছে—প্যাঁক প্যাঁক ছ্যাখ ছ্যাখ আমাদের রাণী! অন্য দল তাদের ডানার দাপাদাপিতে তালে তালে ড্রাম পিটছে। এমন সময় নামলো বৃষ্টি। ছদ্মবেশী হাঁসটার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। সে দেখলে সর্বনাশ! বৃষ্টিতে গায়ের রং যে উঠে যাচ্ছে! সত্যি সত্যিই দেখতে দেখতে সব রং ধুয়ে গিয়ে তার আসল চেহারা ফুটে বেরুল। সবাই বুঝতে পারলে — যাকে তারা আদর করে রানীর আসনে এনে বসিয়েছে—আসলে সে হচ্ছে তাদেরই মতো একটা সাধারণ হাঁস।

আর যায় কোথায়? সবাই মিলে তাড়া করলে—ধর্—ধর্—একটা আস্ত ধাপ্পাবাজ! হাঁসটা কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে।

স্বপ্নটা মাষ্টারমশাইকে বলতেই মাষ্টারমশাই গোরাকে বুঝিয়ে দিলেন —মিথ্যে পরিচয় দিয়ে হয়ত কিছুদিন তুমি অপরের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে নিতে পারো, কিন্তু একদিন তুমি ধরা পড়বেই। সেদিন তোমার লাঞ্ছনার অন্ত থাকবে না। রাজহাঁসটার দুর্দশা গোরা নিজে দেখেছে—সুতরাং এবার থেকে এ-উপদেশ গোরা জীবনেও ভুলবে না।

কাল রাতে গোরা যে স্বপ্ন দেখেছে, তা বেশ মজার! তার ব্যাপারটা হচ্ছে—নীলু-ধোপার বাড়ীতে থাকে এক গাধা, আর তার কুকুর বাঘা। নীলু বাঘাকে দেয় দুধ ভাত, আর গাধাকে দেয় বিচুলি। গাধা বিচুলি খায় আর ভাবে—কী অন্যায়! বাঘাকে দেয় রোজ দুধ ভাত, আর আমার ভাগ্যে দুটো শুকনো বিচুলি?

শুনে বাঘা গাধাকে বোঝায়ঃ দেখ, তুমি নীলুর কাপড়ের বোঝা বয়ে নদীতে নিয়ে যাও আর নিয়ে আসো—তোমার কাজ খুব শক্ত, এ কথা সত্যি! কিন্তু আমার কাজ তার চেয়েও দরকারী। আমি রোজ রাত জেগে সেই কাপড় পাহারা দিই আর চেঁচিয়ে গৃহস্থকে জাগিয়ে রাখি। কত দামী দামী কাপড় জান তো? যদি চোরে চুরি করে সে সব, নীলু কি তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে? সেই জন্যেই ত নীলু এতো তোয়াজ করে রোজ আমাকে দুধ ভাত খাওয়ায়। না হলে আমাকেও আস্তাকুঁড় কুঁড়িয়ে পেট ভরাতে হতো। নীলুর দায় ঠেকেছে আমাকে খামোকা বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে।

গাধা ভাবলে—রাত জেগে চেঁচালেই যদি অমন রোজ রোজ দুধ ভাত মেলে, তবে আমিও পেছপা নই। আমার গলার আওয়াজটাই বা কম কি? বাঘার আওয়াজ তলিয়ে যাবে আমার আওয়াজের কাছে।

সেই রাতে নীলু সবে ঘুমিয়েছে, গাধার সে কী বিকট চীৎকার! পাড়া হক চকিয়ে গেল! ঘুম ভেঙে নীলু রেগেমেগে লাঠি গাছা নিয়ে এসে গাধাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিলে: হতভাগা! রাত্রে একটু ঘুমুতে দিবিনে?

বোকা গাধা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধা-বেড়োন খেলে। ভাবলে, কি অন্যায় বল তো! ভাল খাবারও মিলবে না, আবার চেঁচাতেও দেবে না!

মাষ্টারমশাই গল্পটা শুনে খুব হাসলেন। তারপর গোরাকে এর মর্মটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। যার কাজ তাকেই সাজে। ঈর্ষা বশে অপরের কাজে হাত দিতে গেলে পুরস্কার ত মেলেই না, বরঞ্চ নাজেহাল হতে হয়। স্বপ্নে গোরা নিজে দেখেছে গাধাটার লাঠিপেটা খাওয়া, সুতরাং এ-উপদেশ গোরা কি কখনো ভুল্‌বে? গোরা আর কখনো অপরের কাজে হাত দিতে যাবে না।

আরেকদিন গোরা স্বপ্ন দেখে—একটা শেয়াল একবার এক গেরস্থর গাছে পাকা কাঁঠাল খেয়ে ভারী মজা পেল। কী মিষ্টি আর কেমন সুস্বাদু ফল! আস্বাদটা লেগে রইল তার মুখে। সেই থেকে লোভী শেয়ালটা সব সময় কাঁঠালের সন্ধানে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন এক গেরস্থ বাজার থেকে নানারকম ফলমূল কিনে এনেছে। একটা পাকা কাঁঠালও রয়েছে তার ভেতরে। বাজারের ঝুড়িটা গেরস্থ রাতে তার ঘরের ভেতরে না তুলে বারান্দায় রেখে দিয়েছে। শেয়ালটা গন্ধে গন্ধে সেখানে এসে হাজির। পাকা কাঁঠাল পেয়ে শেয়ালের আনন্দ দেখে কে!

এই জিনিসটার জন্যে আজ কতো দিন ধরে শেয়াল চারদিক আঁতি-পাতি খুঁছে বেড়াচ্ছে। এবার মিলেছে তার সেই প্রিয় ফলটি! আর যায় কোথা?

মহা সুখে শেয়াল কাঁঠালটা সাবড়ে দিলে। এমনি করে ক্রমে শেয়ালের লোভ গেল আরো বেড়ে।

কাঁঠালের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে শেয়ালটা একদিন এক গাছে কাঁঠালের মতো কি একটা দেখতে পেলো। নিশ্চয়ই কাঁঠাল হবে ওটা। এই না ভেবে মহা আনন্দে শেয়াল সেটাতে বসিয়ে দিলে এক কামড়। সেটা ছিল আসলে একটা ভীমরুলের চাক। দেখতে দেখতে সব ভীমরুল চাক থেকে বেরিয়ে এসে ছেঁকে ধরলো শেয়ালকে। শেয়ালের ত প্রাণ যায় যায় অবস্থা!

ছুট্ ছুট্ ছুট্! আদাড়-পাদাড় খানা-খন্দল পেরিয়ে ছুট্তে ছুট্তে শেয়াল সে মুল্লুক ছেড়ে গেল। তবু হতভাগা ভীমরুলগুলো পেছু ছাড়ে না।

কোনোরকমে সে-যাত্রায় শেয়াল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে—ঢুকলো গিয়ে তার গর্তের ভেতরে। ফিরেও একবার চাইল না পেছন পানে। ভীমরুলের হুলে সাত দিন আর গর্ত থেকে বেরুতে পারে নি শেয়াল। কাঁঠালের নেশা একেবারে কেটে গেল শেয়ালের!

গোরার দেখা স্বপ্নের এই গল্পটা শুনে মাষ্টারমশাই বুঝিয়ে দিলেন—অতি লোভ কখনই ভাল নয়। শেয়ালের হুর্দশা দেখে সত্যিই গোরাও জীবনে আর অতি লোভ দেখাবে না।

এবারে যা স্বপ্ন দেখলো গোরা, তা ভারী মজার! গাছে পেকে রয়েছে মস্ত একটা বেল। আর পাশেই বসে রয়েছে একটা দাঁড়কাক পাকা বেলের গন্ধে চারদিক মৌ মৌ করছে।

কাক বল্‌ছে : বেলটা পেকেছে। কিন্তু কথায় আছে—বেল পাকলে কাকের কী লাভ? সত্যিই ত, ঠোঁট দিয়ে ওই শক্ত খোলা ভেঙ্গে বেল খাবে কাকের সে ক্ষমতা কোথায়? নিজে খেতে পাক আর না-ই পাক, কাক বসে বসে পাহারা দেয়। বেলের কাছে ঘেঁষতে দেয়না কাউকে।

একটু দূরে ছিল একটা বাঁদর। বেলটার জন্য হাত বাড়ালো সে।

কাক বলে : কা—কা—কা—তুমি পাবে না।

বাঁদর বলে : বেশ তো মজা! মিছে কেন বাধা দিচ্ছ আমায়। খাবে তো ঠুকরে খোলা ভেঙে মজাসে খাও, আমি বাধা দেবো না। আর না খাও, পথ ছাড়ো, আমি খাবো ও বেল।

কাক বলে : কা—কা—কা, না—না—না!

এই নিয়ে কাকে ও বাঁদরে কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া। সে ঝগড়ার আর মীমাংসা হয় না কোনো। দুজনেই অবশেষে গুম্ মেরে বসে থাকে।

একটু বাদেই হাওয়া লেগে বেলটা ঝুপ করে বোঁটা থেকে খসে নিচে পড়লো। কাকটা হতভম্বের মতো বসে বসে দেখলো শুধু।

বাঁদরটা ছুটে গিয়ে বেলটা কুড়িয়ে আনলো। তারপর কাকের সামনে বসেই বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলো সে বেল।

আড় চোখে বেকুব কাকটার দিকে একবার চেয়ে দেখে বাঁদরটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলে: বেল খুব সুস্বাদু ফল! এটা বানরেরই খাদ্য, কাকেদের নয়।

কাক ঘাড় হেঁট করে বেকুবের মত বসে রইলো।

বাঁদর আবার বলে: কাকরা শুধু বেল পাহারা দেয়। বেল খায় বানরে।

কাকটা সত্যিই জব্দ!

মাষ্টারমশাই গোরাকে বুঝিয়ে দিলেন—হিংসুটে লোকগুলো ওই কাকের মতোই হয়। নিজেও পাচ্ছে না, অথচ অপরে পেলেও তাদের গা জ্বালা করে। পরিণামে এই হিংসুটেরা কাকের মতোই জব্দ হয়। গোরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—আমার যেন এমন স্বভাব সত্যিই না হয়।

এর পরের রাতে গোরা স্বপ্ন দেখে, জলার ধারে—এক বক আর এক শামুক। দূর থেকে দুজনের পুরণো আলাপ।

বক শামুককে বলেঃ তুমি আমাকে দেখে মিথ্যে ভয় পাচ্ছ! আমার কাছে এস বন্ধু। আজ কাল আমি মাছ-মাংস ছেড়ে দিইছি একেবারে। আমিষ ছুঁই না মোটে। আজকাল মহাধার্মিক, বক-ধার্মিক। ধর্ম ছাড়া কিচ্ছু বুঝি না।

বকের কথায় ভরসা পেয়ে শামুক ধীরে ধীরে বকের কাছে এগিয়ে আসে।

বক বলেঃ আরো কাছে এসো বন্ধু, তোমাকে দু একটা ধর্মকথা শোনাই। জানো ত—সংসার অনিত্য, জীবন আরো অনিত্য। মিথ্যে জীবনের মায়া করে লাভ কি?

শামুক আরো কাছে এগিয়ে এলো।

বক বলেঃ আরো কাছে এসো, আরো কাছে। তোমাকে ত বলেছি আমি আজকাল নিরামিষাশী। তবে আর আমাকে ভয় কিসের?

শামুক এবারে একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো।

এবারে বক তাকে খপ করে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে উড়ে চললো।

ভয় পেয়ে শামুক জিজ্ঞেস করেঃ একি বন্ধু? এভাবে আমাকে কোথায় নিয়ে চললে ?

বকের মুখে দুষ্টু হাসি। খানিক বাদে বক নিজের বাড়ীতে এসে পেঁাছালো।

বক গিন্নি বসে আছে, বক খাবার নিয়ে বাড়ী এসেছে। এবার দুজনে আহারে বসবে।

বক বললে : বন্ধু, মুখ খুলে দেখ। এই আমার বাড়ী—মহা ধর্মস্থান!

শামুক বকের বজ্জাতি ধরতে পেরেছে। সে ততক্ষণে তার খোলসের মুখটা ঢাকনা এঁটে শক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছে। বকের কথায় জবাব দেয় : শঠ বন্ধুর কাছে আমার এ দরজা আর খুলবে না।

মাষ্টারমশাই গল্পটা শুনে একটু হেসে বললেন : ভণ্ড বন্ধুর ধাপ্পা-বাজিতে ভুলতে নেই। তাহলে ওই শামুকের মতোই প্রাণ হারাবার জোগাড় হয়। সময়ে শামুক বকের বজ্জাতি ধরতে পেরেছিল বলে, এ-যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেল। গোরা এমন উপদেশ সত্যিই ভুল্‌তে পারে কি ?

এইবার গোরা যে স্বপ্ন দেখলে তা চিরদিন ওর মনে আঁকা থাকবে। কী ভয়ঙ্কর সেই স্বপ্নের শেষটা! দৃশ্যটা এখনো গোরার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করছে!

তিনটে ইঁদুর খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে। খিদের জ্বালায় ওরা বলছে—কিঁচ্ মিচ—কিঁচ্ মিচ্—খাবার কোথায় পাই?

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে গেরস্থর ভাঁড়ারে ঢুকে ওরা দেখলে দাঁতওয়ালা কি একটা লোহার কল পাতা রয়েছে সেখানে। তার মধ্যিখানে ন্যাকড়ায় বাঁধা ভাল খাবার। খিদেয় পেট জ্বলছে কিন্তু এগোতে সাহস হয় না। কিসের কল ওটা। না জেনে বিপদে পড়বে নাকি।

ওদের মধ্যে একটা ইঁদুর বললে: হয়ত ওটা একটা ইঁদুর মারা কল। কাজ নেই খাবার খেয়ে, চলো পালাই।

আর একটি ইঁদুর বললে: সত্যিই ইঁদুর মারা কল কিনা চলনা একটু এগিয়েই দেখা যাক। অন্য ইঁদুরটা বললে: আর এগোব না! দুষ্টু মানুষগুলোকে মোটেই বিশ্বাস নেই। বেড়ালের চেয়ে সাংঘাতিক এই মানুষ। চলো পালাই এখান থেকে!

ভয় পেয়ে দুটো ইঁদুর তক্ষুনি পালিয়ে গেল। অন্য ইঁদুরটা ছিল একটু লোভী। সে মনে মনে বেশ খুশীই হলো। ভাবলে, বোকা দুটো পালালো, ভালই হলো! এখন আমি একাই সবটা খাবার খেয়ে নেবো। ওরা থাকলে আবার ভাগ দিতে হতো ওদেরকে।

মূর্খ ইঁদুরটা বন্ধুদের কথা অগ্রাহ্য করে যেই সেই খাবারে মুখ লাগিয়েছে, আর যায় কোথা? ঝপাং করে সেই জাঁতিকলটা বন্ধ হয়ে গেলো। দুদিক থেকে দু'সারি চোখা চোখা দাঁত জোরে ছুটে এসে ইঁদুরকে চেপে ধরলো! ইঁদুরটার যে কী দশা হলো তা আর বলে বোঝাতে হবে না। দাঁত বের করে একদম মরে গেল।

মাষ্টারমশাই স্বপ্নের গল্পটা শুনে বললেন: বিপদের সম্ভাবনা দেখলে বুদ্ধিমান যারা, তারা সাবধান হয়। কিন্তু মূর্খেরা ওই বোকা ইঁদুরটার মতোই বিপদকে অগ্রাহ্য করে অকালে প্রাণ হারায়।

গোরা খুব মন দিয়ে শুনলে মাষ্টারমশাইয়ের ব্যাখ্যা। ওর মুখ দেখে মনে হয় ইঁদুরটার দশা ভেবে ও খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে। মাষ্টার মশাই খুব খুশী হন।

সত্যি বলতে কি, এমনি ধারা স্বপ্ন পর পর ক'দিন দেখে গোরা আজকাল বেমালুম পাল্টে গেছে। তার সে বদস্বভাব আর মোটেই নেই। শাসনে, উপদেশে এতদিন গোরার যে পরিবর্তন হয়নি, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেই গোরার ভেতরে এখন সে পরিবর্তন এসে গেছে। মাষ্টারমশাই স্বপ্নের অর্থ গোরাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, গোরা সেইভাবে নিজেকে শুধ্‌রে নেবার জন্মে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

বাবা মা এখন কাছে ডেকে গোরাকে যা-উপদেশ দেন, গোরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শোনে এবং সেই ভাবে চল্‌তে চেষ্টা করে।

তাছাড়া ওর মাষ্টারমশাইয়ের দেওয়া বইগুলি—যা গোরা এতদিন অবজ্ঞায় ফেলে রেখে দিয়েছিলো—এবার সে সেগুলি বের করে নিয়ে একমনে বসে বসে পড়ে। ভালো ভালো কথায় ভরা সে বইগুলি।

গোরা আর সে গোরা নেই! শান্ত সুবোধ—লক্ষ্মী ছেলে! বুদ্ধিতে উজ্জ্বল! গোরা হয়েছে এবার শ্রীমান গৌরচন্দ্র !!

তোমরা যদি গোরার মতো স্বপ্ন না-ই দেখো, গোরার এই স্বপ্নের কাহিনী পড়েও নিজেকে শুধরে নিতে পারো। সে-ই বরং ভালো!